স্মরণীয় দিন

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রাপ্তিস্থান :
মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক—শ্রীবিজয় নাথ সরকার
পোষ্ট-অফিস ঘোড়ামারা
(রাজসাহী)

প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৫২।৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে
শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

কেদার বদরী ক্রমসূচী

ভূমিকা

বহুদিন হইতে আমার কেদার-বদরী দেখার ইচ্ছা ছিল। বাস্তবিক এই ইচ্ছা আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব হইতে প্রাপ্ত বলিতে পারি। তিনি শেষ জীবনে এই দুর্গম তীর্থ দুইটি দেখিতে উৎসুক হন এবং (১৯০৩ সালের ৫ই ডিসেম্বরের) *Indian Engineering* পত্রিকায় প্রকাশিত যাত্রী-পথ-সংস্কার আরম্ভের বিবরণ এবং সিষ্টর নিবেদিতার (১৯১০ সালে লিখিত) *The Northern Tirtha* নামক ভ্রমণ-পুস্তক সংগ্রহ করেন। কিন্তু ১৯১৪ সালের মাঝামাঝি তাঁহার কাল পূর্ণ হয়, তাঁহার আর বদরী দর্শন ঘটে না। পিতৃদেবের আকাঙ্ক্ষা যেন আমাতে সংক্রামিত হয়, কিন্তু বহুকাল উহা অপূর্ণ থাকে।

কয়েক বৎসর হইল গাজিপুরবাসী আমার এক ভৃত্য দেশে গিয়া কেদারবদরী-যাত্রা করিয়া আসিয়া তাহার কথা বলে এবং একখানি হিন্দী পথ-প্রদর্শিকা আমাকে দেয়। ইহাতে আমার ঔৎসুক্য বাড়িয়া উঠে। ইহার কিছুদিন পর (অধুনা স্বর্গগত) পণ্ডিতবর পদ্মনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট তাঁহার 'পরশুরামকুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ' পুস্তক উপহার পাই। ইহা পাঠ করিয়া হিমালয়ের দুই প্রান্তে স্থিত এই দুই তীর্থ দেখিতে প্রবল ইচ্ছা হয়। সম্প্রতি—৬৫ বৎসর বয়সে—তাহা পূর্ণ হইয়াছে।

পরশুরামকুণ্ড বা ব্রহ্মকুণ্ড ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। ইহার মাহাত্ম্য এই যে লোহিত্য নদ হিমাচলের উত্তর পিঠ হইতে আসিয়া এই কুণ্ডে সংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নাম লইয়া ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই তীর্থ আসামের সদিয়া সহরের ৫২ মাইল পূবে এক বনাকীর্ণ পর্বত-কন্দরে অবস্থিত। প্রতি বৎসর পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন এই কুণ্ডে স্নানের যোগ হয়। তখন সদিয়া

হইতে ৪৮ মাইল তক মোটর বাস্ চলে, অবশিষ্ট ৪ মাইল হাঁটিতে হয়। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি আমি সস্ত্রীক কলিকাতা হইতে গিয়া কুণ্ডে পৌষ সংক্রান্তির স্নান করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে ফিরিয়া আসি। কেদার-বদরী বাকি থাকে।

ভগবানের কৃপায় তাহাও অচিরে সম্পন্ন হয়। ঘটনাক্রমে একদিন হাবড়া হইতে শিবপুর যাইতে বাসে বদরীর পাণ্ডা চন্দাপ্রসাদ জগন্নাথের প্রতিনিধির সহিত আমার আলাপ হয়। তাঁহার নিকট শুনি যে বড়বাজারে ২৬ নং শিবুঠাকুর লেনে থাকিয়া তিনি যাত্রী সংগ্রহ করেন। যাত্রার উদ্দেশে তথায় গেলে কেদারের পাণ্ডা লক্ষ্মীনারায়ণ যুগলকিশোরের সহিত পরিচয় হয়। তিনিও কলিকাতায়—১০নং রাজেন্দ্রনাথ সেন লেনে—থাকিয়া যাত্রী সংগ্রহ করেন। এই দুই পাণ্ডা স্থির করিয়া, ১৯৩৯ সালের ১লা মে আমি সস্ত্রীক কলিকাতা হইতে রওনা হই এবং উভয় তীর্থ করিয়া ৮ই জুন ফিরিয়া আসি। আমাদের সবসমেত ৫৫০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

পাণ্ডা লক্ষ্মীনারায়ণ কলিকাতা হইতে আমাদের সঙ্গী হন এবং কেদার-দর্শন করাইয়া ফেরার পথে গুপ্তকাশী পর্যন্ত সাথে থাকেন। পাণ্ডা চন্দাপ্রসাদ বদরীধামে উপস্থিত থাকিয়া আমাদের অবস্থানাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। উভয় পাণ্ডার নিকটই আমরা যথেষ্ট সাহায্য পাই। আর চটি-নির্বাচনে পাণ্ডা রামপ্রসাদ সূর্যপ্রসাদের বাঙ্গলা পুস্তিকা কাজ দেয়। কিন্তু আমরা সর্বাধিক সাহায্য পাই পদ্মনাথ বাবুর 'পরিভ্রমণ' পুস্তক হইতে। তিনি সমস্ত পথ পদব্রজে, ৫ সুযোগ্য পাণ্ডার গোমস্তা সহকারে গমন করেন। তাঁহার লেখনী যেমন সরস, সবদিকে—বিশেষতঃ যাত্রীদের বাস্তবিক আবশ্যকের দিকে—নজর তেমনি প্রখর। তাঁহার পুস্তক ১৯১০ সালে লিখিত কিন্তু

গত ত্রিশ বৎসরে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। এখনও উহা সব শ্রেণীর যাত্রীর পক্ষে উপযোগী রহিয়াছে।

বদরী হইতে ফেরার পথে রাণীখেতে আসিয়া আমরা কুমাওনের আরও কয়েকটি স্থান দেখি। প্রাচীনকাল হইতে গড়বাল ও কুমাওনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং অধুনা অল্মোড়া সহর হইতে কৈলাস যাত্রা ও নন্দাদেবী প্রভৃতি হিমালয়শৃঙ্গারোহণ যাত্রা আরম্ভ হয়। আমরা অল্মোড়া, নৈনিতাল প্রভৃতি যে কয়েকটি স্থান দেখি তাহাদের কথা 'কুমাওনে সাতদিন' আখ্যা দিয়া এই পুস্তকে সন্নিবেশ করিয়াছি।

আমাদের এই ভ্রমণে তীর্থ-মাহাত্ম্য ছাড়া অন্য অনেক বিষয় আমাদের দৃষ্টি ও চিন্তা আকর্ষণ করে। দেশে ফিরিয়া আমার নিজের নোট এবং কয়েকখানি পুস্তকের সাহায্যে এ বিষয়ে চর্চা করি। তাহার ফল পরিশিষ্টে নিবদ্ধ হইল। শেষাশেষি Mr. E. T. Atkinson প্রণীত *The Himalayan Districts* নামক দুষ্প্রাপ্য গেজেটিয়রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড আমি দেখিতে পাই। উহা হইতে অনেক তথ্য পাইয়াছি। যানবাহন ও পাথেয়াদির কথাও পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

লিখিত বিষয় অনুধাবনে সাহায্য হইবে বলিয়া সমগ্র উত্তরাখণ্ডের এক ম্যাপ দেওয়া হইল। এই পুস্তক ছাপাইতে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ নারায়ণ চন্দ্র সরকার হইতে আমি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

ঘোড়ামারা, রাজসাহী — শ্রীবিজয় নাথ সরকার

২৪ মে, ১৯৪০

কেদার, বদরী ও কুম্ভ

হরদ্বার (৩রা মে)

১৯৩৯ সালের ১লা মে (১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ১৭ই বৈশাখ) তারিখে দেরাডুন এক্সপ্রেসে কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া ৩রা মে সকালে আমরা হরদ্বার পৌছিলাম। সে দিন চন্দ্রগ্রহণের যোগ, তাই গাড়ীতে বিষম ভিড় ছিল। ষ্টেশনের বাহিরে ৺হরিহর শাস্ত্রীর পুত্র শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্রকে আমাদের হরদ্বারের পাণ্ডা মনোনীত করিয়া তাঁহার গৌঘাট-স্থিত যাত্রীনিবাসে গেলাম। উহা হর-কি-পাইরি ঘাটের অল্প ভাটিতে গঙ্গার উপরে বেশ সুবিধার জায়গায় অবস্থিত।

পূর্ব বৎসর আসিয়া হরদ্বারের কতক স্থান ও প্রাচীন তীর্থ কনখলের দক্ষ-যজ্ঞশালা এবং এই দুই স্থানের মধ্যবর্তী প্রসিদ্ধ গঙ্গা-নহর, গুরুকুল, ঋষিকুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান আমরা দেখিয়া গিয়াছিলাম। হর-কি-পাইরি ঘাটে স্নান বাকি ছিল। এবার তাহা হইল। এই ঘাটে পঞ্জাব প্রদেশের বহু যাত্রী ছোট ছোট থলিয়ায় পুরিয়া আত্মীয়দের অস্থি গঙ্গাজলে অর্পণ করে। কতকগুলি লোক এই থলি তুলিয়া তাহার মধ্য হইতে সোনা রূপা বাহির করিয়া লইতেছে। নিক্ষিপ্ত অস্থি কতক স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, কতক নদীগর্ভে পড়িয়া থাকিতেছে। এই ঘাটের খর স্রোতে অসংখ্য মহাশীর্ষ মৎস্য যাত্রীদের নিক্ষিপ্ত খাদ্য আহারের জন্য ভিড় করিয়া থাকে।

কেদারখণ্ডে হরদ্বার অঞ্চলের নাম মায়াক্ষেত্র। তাহার প্রধান স্থান মায়াপুর বা কনখল, ভারতের সপ্তপুরীর এক পুরী। হরদ্বারের পাণ্ডারা

সকলেই কনখলে বাস করেন। হরদ্বার আধুনিক সহর। হরদ্বার হইতে গঙ্গার অপর পারে ছয় মাইল দূরস্থ চণ্ডীর মন্দির দেখা যায়। ইহার উল্লেখ কেদারখণ্ডে আছে। আমাদের উহা দেখার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সময়ের অভাবে দেখা হইল না।

হর-কি-পাইরি ঘাটে স্নান করিয়া বাসায় ফিরিয়া আহার করিয়া বিশ্রাম করিলাম। বদরী যাত্রার পাণ্ডা ও কুলিগণ বারে বারে খোঁজ করিতে লাগিল, কিন্তু আমাদের পাণ্ডা পূর্বেই ঠিক ছিল বলিয়া এখানে কোন ব্যবস্থা করিলাম না। আমাদের কেদারনাথের পাণ্ডা লক্ষ্মী-নারায়ণ কলিকাতা হইতে আমাদের সাথে আসিয়াছিলেন। বিকালে তাঁহার সহিত বাহির হইয়া যাত্রার জন্য পর্বতারোহণের লাঠি ও কিছু মেওয়া মিছরি ও সে রাত্রের জন্য খাবার কিনিয়া রাখিয়া গ্রহণের স্নানের জন্য বাহির হইলাম। গঙ্গার প্রশস্ত পাথর-বাঁধান তটভূমিতে গ্রহণের মেলা বসিয়াছে। বিপুল জনসমাগম। নানা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে বক্তৃতা ও ব্যাখ্যান চলিয়াছে। নানা দ্রব্যের দোকান বসিয়াছে। সন্ধ্যা হইতে এসব উঠিয়া গেল, জনসমাগম বাড়িতে লাগিল।

সেই নদীতীরে দাঁড়াইয়া আমার ৪৩ বৎসর পূর্বেকার কথা মনে হইল। তখন রুড়কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে সার্ভে করিতে আসিয়া এক ছুটির দিনে আমরা কয়েকটি সহাধ্যায়ী পিক্‌নিক্ করিতে সন্ধ্যাকালে এই ঘাটে জমা হইয়াছিলাম। তার মধ্যে এক জন গান ধরিলেন—

"গাও স্রোতস্বতি, সুমধুর কল্লোলে,
নাচ গো তরঙ্গিণি, মৃদু মারুত হিল্লোলে,
আমিও তোমারি সনে, গা'ব গো আনন্দ-মনে,
ওহে হৃদয় নাথ, তব চারু চরিত গাথা।"

সেই রমণীয় নদীতটে, সেই সন্ধ্যা, সেই গান, যেন ফিরিয়া পাইলাম, কিন্তু আমাদের সেই গায়ক আজ কোথায়?

রাত্রি হইলে পর্বতের পশ্চাৎ হইতে রাহুগ্রস্ত চন্দ্র উদিত হইল। তখন স্নানের ধুম পড়িয়া গেল। স্নান করিয়া উঠিয়া আমরা ঘাটে বসিয়া থাকিলাম ও গ্রহণ-মুক্তির পর রাত্রি দশটায় বাসায় ফিরিয়া আহার করিয়া নিদ্রা গেলাম। পরদিন হরদ্বার ছাড়িব বলিয়া বিকালে পাণ্ডা হরিশ্চন্দ্রের কনখল চলিয়া যাইবার পূর্বে তাঁহার নিকট বিদায় হইয়াছিলাম।

হরদ্বার হইতে ঋষিকেশ। ১৪ মাইল

স্বর্গাশ্রম দর্শন (৪ঠা মে)

আহারাদির পর দ্বিপ্রহরে হরদ্বারে বাস্ ধরিয়া ঘণ্টা দেড়েক পরে ঋষিকেশ পৌঁছিলাম। ভাড়া আট আনা করিয়া লাগিল। রেলের লাইনও আছে, কিন্তু আজকাল বাসে যাওয়াই সুবিধা। সুন্দর সড়ক, মধ্যপথে সত্যনারায়ণের মন্দিরে বাস্ কিছুক্ষণ থামিল। এখানে কালিকমলি-বাবার ধর্মশালা ও পিয়াও আছে।

ঋষিকেশে কালিকমলি-বাবার ধর্মশালার একটি কুঠরি লইয়া জিনিসপত্র তথায় বন্ধ করিয়া (এখানে বানরের বড় উপদ্রব) আমরা তিনটার সময় লছমনজির মন্দির ও অপর পারের স্বর্গাশ্রম প্রতিষ্ঠান দেখার জন্য মোটর বাসে রওনা হইলাম। এই তিন মাইল পথের যাতায়াতী ভাড়া আট আনা।

মাইল দেড়েক পর মুনিকি-রেতি নামক স্থান পাইলাম। এখানে গড়বাল রাজের পুলিশ চৌকি আর কয়েকটি দোকান আছে। আরও দেড় মাইল চলিয়া লছমনজির মন্দিরের নিকট বাস্ আমাদিগকে নামাইয়া

দিয়া মুনিকি-রেতিতে ফিরিয়া গেল, কথা থাকিল সেখানে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত আমাদের জন্য অপেক্ষা করিবে। আমরা যেখানে নামিলাম সেখান হইতে এক মোটর সড়ক টিহরীরাজের নূতন রাজধানী নরেন্দ্রনগরে গিয়াছে। আর এক সড়ক গঙ্গার উত্তর তীর দিয়া দেবপ্রয়াগে গিয়াছে, আর পুরাতন সঙ্কীর্ণ যাত্রীপথ লছমনজির মন্দির হইয়া গঙ্গার দিকে নামিয়া গিয়াছে।

আমরা শেষোক্ত পথে গিয়া লছমনজির মন্দির দর্শন করিলাম। এখানে নাকি লক্ষ্মণ তপস্যা করিয়াছিলেন। কেদারখণ্ডে এ স্থানকে লক্ষ্মণ-স্থান বলা হইয়াছে। পথের ধারে অনেক কুষ্ঠরোগী ভিক্ষার জন্য বসিয়া আছে। কিছু পাই পয়সা লইয়া উহাদিগকে বিতরণ করিতে করিতে নদীর তীরে আসিলাম। পথে কলিকাতার ঝামাপুকুরের মিত্রবাবুদের মিত্রালয় নামে সুন্দর একটি বাঙ্গলা দেখিলাম। ইহার নিকটে গঙ্গার ধারে ধ্রুব কুণ্ড, ও তাহার উপরের তীরভূমি কেদারখণ্ডে উল্লিখিত তপোবন। ইহাই বোধ হয় বর্তমানে মুনিকি-রেতি হইয়াছে। এখানে এখনও শীতকালে সাধুরা বাস করেন।

তারপর এক সুদৃঢ় লোহার ঝুলান পুলে গঙ্গা পার হইলাম। এইখানে আগে এ দেশের তৈয়ারী এক দড়ির ঝুলায় গঙ্গা পার হইতে হইত। তাহা হইতেই এ স্থানের নাম লছমনঝুলা হইয়াছে। বর্তমান লোহার পুল সুরজমল ঝুনঝুনবালার ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে। ইহা সাড়ে চারিশত ফুট লম্বা ও প্রস্থে ফুট ছয়েক, গঙ্গাবক্ষের ষাট ফুট উপরে রহিয়াছে। পুল পার হইয়া যাত্রাপথ বামে ছাড়িয়া দিয়া আমরা পশ্চিমমুখে চলিলাম। প্রথমে রৌদ্রে একটু কষ্ট হইল। কিছুদূর চলিয়া এক সাধুর স্থাপিত মন্দিরে জল পান করিয়া উপরে উঠিয়া এক আম্রবীথি ধরিয়া মাইল খানেক গিয়া স্বর্গাশ্রমে পৌছিলাম। পথে ডান

দিকে ছোট ছোট টিনের ঘর দেখা গেল। উহা নাকি সাধুদের বাসস্থান। স্বর্গাশ্রম কালিকমলি-বাবার আত্মপ্রকাশ নামে এক শিষ্যের স্থাপিত। এক চত্বরের মধ্যস্থলে উচ্চ মন্দির, চারিদিকে বাসের ঘর। লোক সমাগম বিশেষ দেখিলাম না। আমরা চত্বর পার হইয়া উহার সংলগ্ন গঙ্গার উপর সুন্দর বাঁধা ঘাটে স্নান করিয়া জলযোগ করিলাম। তারপর মঠের নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া অপর তীরে মুনিকি-রেতিতে উঠিলাম। পার হইবার সময় নৌকা হইতে আটার গুলি ফেলা হইল, আর তাহার লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে মহাশীর্ষ মৎস্য নৌকার সঙ্গে আসিতে লাগিল। মুনিকি-রেতিতে চা, সোডা ওয়াটার ইত্যাদি ও খাবারের দোকান আছে। আমরা জলযোগ করিয়া আমাদের বাস্ ধরিয়া ঋষিকেশে ফিরিলাম।

ঋষিকেশ হইতে লছমনঝুলা। ৩ মাইল

(৫ই মে)

ঋষিকেশ প্রাচীন তীর্থ না হইলেও আজকাল সহরের মত হইয়া উঠিয়াছে। এইস্থানে দেরাদুন জেলা, গড়বাল জেলা ও টিহরী-গড়বাল রাজ্য মিলিত হইয়াছে। টিহরী-রাজের নূতন রাজধানী নরেন্দ্রনগর এখান হইতে মাত্র দশ মাইল। এখান হইতে দেবপ্রয়াগ-গামী মোটর বাস্ ছাড়ে, আর কেদারবদরী-যাত্রাপথের জন্য কুলী, ডাণ্ডি প্রভৃতি ঠিক করার ও রেজিষ্টারী করার ইহা প্রধান কেন্দ্র। তার উপর এখানে মহাত্মা কালিকমলি-বাবার বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের হেড কোয়ার্টার্স। ঋষিকেশে ঐ প্রতিষ্ঠানের দাতব্য ঔষধালয়, বৃহৎ ধর্মশালা ও সদাব্রত এবং নিকটেই সংস্কৃত পাঠশালা ও আয়ুর্বেদিক বিদ্যালয় আছে। ফলে

স্থানটি খুব বড় হইয়াছে। এখানকার বাজারে সব রকম দ্রব্য ও উত্তরাখণ্ড যাত্রা সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পাওয়া যায়।

ঋষিকেশে গঙ্গার ঘাট কাঁচা, কিন্তু সুরক্ষিত। এখানেও অসংখ্য মহাশির্ষ মৎস্য যাত্রীদের নিক্ষিপ্ত আহার গ্রাসের জন্য ভিড় করিয়া থাকে। ঘাটের উপরে রামচন্দ্রের মন্দির ও উহার সামনে ঋষিকুণ্ড নামে বাঁধান জলাশয়। এখানে যাত্রীরা স্নানতর্পণ করে। আমরা সকালে উঠিয়া গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিয়া ধর্মশালায় পাকের ব্যবস্থা করিলাম।

আমরা মনস্থ করিয়াছিলাম যে মোটর বাসে দেবপ্রয়াগ গিয়া তথায় ডাণ্ডি ও কুলী ঠিক করিব। বাসের সন্ধান করিতে গিয়া জানিলাম যে উহা দুপুরের পরে ছাড়ে। বাস-ষ্ট্যাণ্ডের কাছে টিহরী দরবারের কুলী রেজিষ্টারী অফিস এবং এক ডাণ্ডির গুদাম। সেখানে এবং তাহার নিকটে বৃটিশ গড়বালের লোকদের স্থাপিত ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর অফিসে খবর লইয়া আমরা ঠিক করিলাম যে দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত বাসে যাইব না, ঋষিকেশে ডাণ্ডি ও কুলী ঠিক করিয়া তথা হইতেই পুরাতন যাত্রীপথ ধরিব।

পথ, পাথেয় ও যানবাহনের কথা পরিশিষ্টে থাকিল। এই দীর্ঘ ও কঠিন যাত্রা পদব্রজে সমাধা করার মত শক্তি আমাদের নাই। তাই দুই জনের জন্য দুইখানি ডাণ্ডির ব্যবস্থা করিলাম। তবে পথে অনেক স্থানে আমরা নামিয়া পদব্রজে গিয়াছি। টিহরী ষ্টেটের অধিবাসী কুলী ঠিক করা হইল। কেদার, বদরী, ত্রিযুগী ও তুঙ্গনাথ দর্শন করাইয়া আমাদিগকে রাণীখেতে নামাইয়া দিবার পারিশ্রমিক এক এক ডাণ্ডির চারি কুলীর জন্য এক শত ত্রিশ টাকা স্থির হইল। ইহা শুধু খা ভাড়া অর্থাৎ কুলীরা কোন খোরাকি পাইবে না আর তাহাদের দেয় রাজকর

ইহা হইতে কাটা যাইবে। কুলীদের এক সর্দারের নাম গেন্নু, সে ব্রাহ্মণ কিন্তু নিরক্ষর, অপর সর্দারের নাম মুকুন্দা, সে ছত্রি, মাত্র নাম স্বাক্ষর করিতে পারে। চল্লিশ টাকা আগাম দিয়া দরবারের অফিসে চিঠ্‌ঠি কাটাইয়া নিকটস্থ ডাণ্ডির ডিপোতে গেলাম। তের টাকা করিয়া দুইখানি ডাণ্ডি কিনিয়া তাহাতে চামড়ার যোত লাগাইতে বলিয়া ধর্মশালায় ফিরিয়া আমরা আহার করিয়া বিকালে রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কালিকমলি-বাবার অফিস হইতে উত্তরাখণ্ডের ম্যাপ, ধর্মশালাদির তালিকা ও দুই প্রকার ঔষধের চূর্ণ লইলাম। পাণ্ডা লক্ষ্মীনারায়ণ হরদ্বার হইতে আসিয়া পৌঁছিল ও আমরা পুরাতন যাত্রীপথে যাইতেছি শুনিয়া, তিন দিন পর বাসযোগে গিয়া দেবপ্রয়াগে আমাদের সহিত মিলিবে বলিয়া গেল।

কথামত বিকাল পাঁচটায় কুলীরা আসিয়া আমাদের জিনিসপত্র ডাণ্ডিতে তুলিল। বসিতে যাইয়া দেখি জিনিসে অসুবিধা হইতেছে। কুলীরাও কুঁই কাঁই করিতে লাগিল, যদিও এই জিনিসগুলি দেখাইয়া তাহাদিগের পারিশ্রমিক ঠিক হইয়াছিল। দেখা গেল যে একুশ সের ওজনের বিছানাদি বাহির করিয়া দিলে ডাণ্ডিতে অসুবিধা হইবে না। তখন ওখানে উপস্থিত একটি তরুণ কুলীকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঐ মাল লইয়া যাইবার জন্য একুশ টাকা শুখ্‌খা ভাড়ায় ঠিক করা হইল। অফিসে তখন খুব ভীড় ছিল বলিয়া চিঠ্‌ঠি কাটান গেল না, কথা থাকিল দেবপ্রয়াগে তাহা করা হইবে।

এই সব ব্যবস্থা করিতে সন্ধ্যা ছয়টা বাজিল। তখন 'জয় বদরী বিশাল কি জয়' ধ্বনির সঙ্গে আমাদের ডাণ্ডি উঠিল। দেড় মাইল চলিয়া মুনিকি-রেতি চৌকিতে চিঠ্‌ঠি দেখাইয়া আরও মাইল দেড় চলিয়া লছমনঝুলার পুলে গঙ্গা পার হইয়া নিকটের এক মন্দিরে আমরা

যাত্রার প্রথম রাত্রির মোকাম করিলাম। বাজার হইতে পুরি, তরকারী আনিয়া রাত্রের আহার হইল। লছমনঝুলা হইতে হরদ্বার ১৭ মাইল, বদরীধাম ১৬৪ মাইল।

মুনিকি-রেতির কিছু পূর্বে একটি সরু পথ শেষ-ধারা বা লক্ষ্মণকুণ্ডে নামিয়া গিয়াছে, আবার সেখান হইতে উঠিয়া উপরে সড়কে মিলিয়াছে। পথের দুই মাথায় বিজ্ঞাপন আছে যে রাবণ ও মেঘনাদকে বধ করার জন্য রাম ও লক্ষ্মণ এই তীর্থে প্রায়শ্চিত্ত করেন।

লছমনঝুলা—বিজনি—মহাদেব চটি। ২১ মাইল

(৬ই মে)

প্রাতঃকৃত্য সারিয়া এবং বিছানা ও মালপত্র গুছাইয়া বাঁধিয়া লইয়া ভোর পাঁচটায় আমরা বাহির হইলাম। এখান হইতে আমাদের যাত্রীপথে চলা আরম্ভ হইল। এই পথ চওড়া প্রায় চারি হাত, প্রায় স্থানেই উহার একদিকে পাহাড়ের গা, অন্য দিকে গঙ্গা বা তাহার কোন উপনদীর খাত। দেবপ্রয়াগের নূতন মোটর সড়ক গঙ্গার অপর তীর দিয়া গিয়াছে।

লছমনঝুলার দুই মাইল পর গরুড় চটি। এখানে গরুড়ের মন্দির এবং কালিকমলি-বাবার ধর্মশালা ও পিয়াও রহিয়াছে। আরও দুই মাইল পর ফুল চটি। এখানে গঙ্গার কিনারা ছাড়িয়া দিয়া ডাইন দিকে মোড় লইয়া মাইল দুই পর গুলর চটিতে গঙ্গার এক উপনদী হিউল নদীর তীরে পড়িলাম। উহা ধরিয়া মাইল খানেক চলিয়া লোহার পুলে হিউল পার হইয়া অপর তীর ধরিয়া মাইল দুই চলিয়া নাইমোহনা চটিতে পৌঁছিলাম। চটিতে কয়েকখানি দোকান ও জলের নল আছে এবং নিকটে হিউল নদী। সামনে বিজনি চটি পর্যন্ত তিন মাইল টানা

চড়াই পড়িবে বলিয়া কুলীরা পয়সা লইয়া এখানে জলপান ও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া লইল।

কতক হাটিয়া কতক ডাণ্ডিতে চড়িয়া আমরা চড়াই উঠিতে লাগিলাম। মাইল দুই পর একটি ঝরণা ও ছোট চটি এবং তাহার আধ মাইল পর বিজনি ডাকবাঙ্গলা পার হইয়া বেলা দশটায় বিজনি চটিতে পৌছিলাম ও তুপুরে পাকশাক করার জন্য এক দোকান ঘরের দোতালায় উঠিলাম।

চড়াই উঠিতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হইল না। কিন্তু যাঁহারা রৌদ্রের তেজের সময় হাঁটিয়া একটানা উঠেন তাঁহাদের পক্ষে এ চড়াই বিশেষ কষ্টকর। তাই বাস্ সার্ভিসের বিজ্ঞাপনে ইহাকে 'বিজনি কি দমফুলানেবালি ভয়ঙ্কর চড়াই' বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। পদ্মনাথ বাবু নিজের কথা এইরূপ লিথিয়াছেন—"চড়াই উঠিতে গলদ্ঘর্ম হইতে দেখিয়া গোমস্তা বলিলেন, 'বাবুজি, গরুড় ভগবান্কে স্মরণ করুন; ভগবান বলিয়াছেন, যাহারা আমার দর্শনার্থ আসিয়া পথশ্রমে ক্লান্ত হয়, তাহাদিগকে আমি গরুড় দ্বারা আমার নিকট আনয়ন করি।' গোমস্তা ঠাকুরের কথায় আমরা 'গরুড় ভগবান কি জয়' ডাকিলাম বটে, কিন্তু পক্ষিরাজ আসিলেন না। কথাটা কি বাস্তবিক মিথ্যা? তাহা নয়; এ গরুড় শরীরী বিহঙ্গম নহে কিন্তু তথাপি নারায়ণের বাহন; হৃদয়ের ভক্তি বিশ্বাসই সেই গরুড়, তাহাই ভগবানের নিয়ত বসিবার স্থান। যখন পথক্লেশে শরীর তুর্বল হয়, তখন মনের ভক্তি বিশ্বাসের বলেই আমাদিগকে তাঁহার দিকে চালনা করিয়া লইয়া যায়। * * এইরূপ ভাবনায় বাস্তবিক পথ যেন কতকটা সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।" বোধ হয় এই ধারণাতে পথের প্রায় সকল কঠিন স্থানে—এমন কি কেদারে পৌছিবার আগের চড়াইয়ের মাথায়—গরুড় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত এবং

দিবাবসানে চটিতে পৌছিয়া যাত্রীদের মধ্যে গরুড়ের নাম করিয়া প্রসাদ বিতরণের প্রথা হইয়াছে। বিদেশী লেখকেরাও বদরীর পথে যাত্রীদের মুখে এই দৃঢ় ভক্তির আভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। বাস্তবিক, কোন মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি মন একাগ্র হইলে পথের কোন কষ্টই যেন কষ্ট বোধ হয় না।

স্নানাহার ও বিশ্রাম করিয়া বিকাল তিনটায় বিজনি চটি হইতে বাহির হইলাম। মাইল দেড়েক অল্প বিস্তর চড়াই উঠিলে এক দিকে দূরে সবুজ রংএর ফিতার মত গঙ্গার ধারা এবং অপর দিকে হিউল নদী দেখা গেল। তাহার পর আরও এক মাইল চড়াই উঠিয়া কুণ্ড চটিতে জল পাইলাম। তারপর তিন মাইল জলহীন খাড়া উৎরাই নামিয়া গঙ্গার তীরে বন্দরভেল চটিতে পৌছিলাম। সেখান হইতে গঙ্গার ধার দিয়া তিন মাইল উৎখাত পথ চলিয়া সন্ধ্যাকালে গঙ্গার তীরে মহাদেব চটিতে পৌছিয়া একটি দোকান ঘরের দ্বিতলে পাকশাক করিয়া রাত্রি যাপন করিলাম। রাত্রে গরম বোধ হইল।

মহাদেব চটি—ব্যাস চটি—সৌড় চটি। ১৮ মাইল

(৭ই মে)

ভোরে উঠিয়া রওনা হইতে প্রস্তুত হইতেছি এমন সময় একটি কুলীকে বিচ্ছুতে কাটিল। লোকটি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। বিচ্ছু-কাটার ভাল ঔষধ বিচ্ছুকে চটকাইয়া ঐ রস লাগাইয়া দেওয়া। ক্ষেত্রে বিচ্ছু দেখা গেল না। আমার সঙ্গের আইডিন প্রভৃতিতে কোন ফল হইল না। তখন কুলীরা লোকটিকে ছটাক খানেক ঘি খাওয়াইয়া কম্বল চাপা দিয়া রাখিল। খানিক পরে ঘাম ছুটিয়া লোকটি সুস্থ হইল, আমরাও রওনা হইলাম, তবে একটু বেলা হইল।

রওনা হওয়ার সময় দেখিলাম মহাদেব চটি দুই ভাগে বিভক্ত বেশ বড় চটি, মধ্য দিয়া একটি প্রস্তর-বিকীর্ণ শুষ্ক নালার খাত। এই চটি হইতে আধ মাইল পর ডাক বাঙ্গলা ও আরও আধ মাইল পর কোটলিভেল চটি, পাইলাম। ইহার পর একটা ঝরণা পার হইলে পথ গঙ্গার খাড়া কিনারা ধরিয়া উঠিতে লাগিল, কোথায় পার্শ্বের খাড়া পাথর কাটিয়া, কোথায় নদীর উপর ঝুঁকিয়া পথ যাইতেছে। তিন মাইল পর সিমল চটি পাওয়া গেল। তাহার পর সহজ পথে তিন মাইল গিয়া কণ্ডি চটি। এখানে বেশ জল ও গাছের ছায়া, আর একটি ছোট মন্দির ও কালিকমলি-বাবার দাতব্য ঔষধালয় আছে। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আড়াই মাইল চড়াই উঠিয়া ও এক মাইল খাড়া উৎরাই নামিয়া নয়ার নদীর পুল পার হইয়া আধ মাইল আন্দাজ গিয়া ব্যাস চটিতে পৌছিলাম। নয়ারের পুল হইতে এক শাখা-পথ দক্ষিণে দুগড্ডার দিকে গিয়াছে। সকালে বাহির হইতে বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া, ব্যাস চটিতে পৌছিতে প্রায় দুপুর হইয়া গেল। সেখানে কালিকমলি-বাবার ধর্মশালায় উঠিলাম।

ব্যাস চটিতে স্থায়ী বসতি ও দোকান আছে, গঙ্গা কাছে, জলের নলও আছে। বাজারের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে ব্যাসদেবের মূর্তি আছে। পূজারি এক ক্ষুদ্র বালক। এই মন্দিরটি নাকি আধুনিক। রেবা রাজ্যের কোন রাণীর ব্যয়ে নির্মিত। আসল ব্যাসদেবের মন্দির আরও পোয়া মাইল আগে পথের ধারে পাওয়া যাইবে।

আমরা এখানে গঙ্গায় স্নান করিয়া আহারাদি করিয়া বিকাল তিনটায় বাহির হইলাম। চটির কাছে এক শুষ্ক নালা ও তাহার খানিক পর একটি ঝরণা পার হইয়া ব্যাসের আসল মন্দির পাইলাম। মন্দিরটি প্রাচীন কিন্তু অধুনা অনাদৃত। এখানেও পূজারি এক বালক।

"মন্দিরে ব্যাসের পুত্র হইতে প্রপিতামহ পর্যন্ত পাঁচ পুরুষের বিগ্রহ আছে"।

ব্যাস চটি হইতে দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত পথ উত্তর-মুখী ও ছায়াবিহীন, তাই বিকালে রৌদ্রে কষ্টকর। গঙ্গার ধার দিয়া পথ, কিন্তু কোন কঠিন চড়াই বা উৎরাই নাই। ওপারে পাহাড়ের গা দিয়া মোটরের সড়ক ও স্থানে স্থানে ঝরণা হইতে ক্ষেতে জল দেওয়া হইতেছে দেখা গেল। এক স্থানে পারাপারের জন্য গঙ্গার উপর লোহার ঝুলন পুল তৈয়ার হইতেছে দেখিলাম। ব্যাস চটি হইতে এক মাইল পর ভাটা নামে ক্ষুদ্র চটি। তাহাতে প্রচুর জল ও এক বাগানের মধ্যে গোপালের মন্দির আছে। ইহার দুই মাইল পর ছাতারি চটি ও আরও দুই মাইল পর উমরাসু চটি। তাহার মাইল খানেক পর একটি ছোট নদীর পুল পার হইয়া আরও এক মাইল গিয়া সৌড় চটিতে আমরা রাত্রে অবস্থান করিলাম। এখান হইতে দেবপ্রয়াগ মাত্র দুই মাইল দূরে, কিন্তু সেখানে যাত্রীর ভিড়ের জন্য থাকার স্থান, জ্বালানি কাঠ, পায়খানা প্রভৃতির অসুবিধা হইবে বলিয়া কুলীরা এই চটিতে রহিয়া গেল। এই কারণে অন্যত্রও তাহারা যথা সম্ভব সহরের আগের অথবা পরের চটিতে রাত্রের মোকাম করিত।

সৌড় চটি গঙ্গার উপরে উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি আমগাছ আছে। চটিটি ছোট। রাত্রি হইয়াছিল বলিয়া আমাদের পাক করা হইলনা। সঙ্গের মিষ্টাদি খাইয়া শয়ন করিলাম।

সৌড়—দেবপ্রয়াগ—রাণীবাগ। ৯ মাইল
(৮ ইমে)

ভোরে উঠিয়া আমার পাতলা দাস্ত হইল, কিন্তু সে জন্য যাত্রা স্থগিত করিলাম না। খানিক দূর পর্যন্ত পাহাড়ের গা হলদে রংএর

মৃত্তিকাময়। অল্প দূর অগ্রসর হইতে দূরে পাহাড়ের গায়ে দেবপ্রয়াগ সহর দেখা গেল। আরও মাইলখানেক চলিয়া তথায় পৌছিয়া কালিকমলি-বাবার ধর্মশালায় উঠিলাম। এখানে যাত্রীর খুব ভিড়। আমরা দুপুরে থাকার জন্য একটি কক্ষ পাইলাম। এই ধর্মশালা অলকানন্দার পূর্ব বা বৃটিশ অধিকৃত তীরে অবস্থিত। ইহার নিকটে পোষ্ট অফিস, বৃটিশ প্রজা স্থাপিত ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির অফিস ও বাজার। কিন্তু প্রকৃত দেবপ্রয়াগ সহর অর্থাৎ অলকানন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গম অলকানন্দার অপর পারে টিহরী রাজ্যে। সেখানে বদরীর পাণ্ডাদের বসতি ও যাত্রীনিবাস-সমূহ, বেশীর ভাগ দোকান, দরবারের কুলী-রেজিষ্টারী অফিস, সঙ্গমের উপর স্নান ও পিণ্ডদানের স্থান এবং প্রধান মন্দির, যাহাতে রামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত। ঋষিকেশ হইতে মোটরসড়ক ভাগীরথীর অপর পারে শেষ হইয়াছিল, এখন উহাকে শ্রীনগর পর্যন্ত বাড়াইবার জন্য ভাগীরথীর উপর এক নূতন পুল নির্মিত হইতেছে। দেবপ্রয়াগের দুই অংশই যাত্রী, ডাণ্ডি ও কুলী সমাগমে ভরপুর।

দেবপ্রয়াগ গড়বালের একটি প্রধান কেন্দ্র। চারিদিক হইতে পথ আসিয়া এখানে মিলিয়াছে। এখান হইতে হরদ্বার ৫৮ মাইল, ব্যাস চটি হইয়া দুগড্ডা ৪০ মাইল, টিহরী ৩৩ মাইল এবং শ্রীনগর ১৯ মাইল। টিহরী হইয়া গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী যাওয়া যায়, আর শ্রীনগর হইয়া কেদার ও বদরীর পথ। ইহা দেখিয়াই বোধ হয় বদরীর পাণ্ডারা এখানে বসতি করিয়াছেন। এখান হইতে বদরী ১২৫ মাইল দূর। পাণ্ডারা এক পৃথক্ সম্প্রদায়ভুক্ত। বলেন যে তাঁহাদের পূর্বপুরুষ মহারাষ্ট্র-দেশ হইতে দেবপ্রয়াগে আসেন। এ দিকের অন্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের বিবাহ সম্বন্ধ নাই। রামচন্দ্র-মন্দিরে পূজার ভার ইঁহাদের হাতে। এই মন্দির বোধ হয় গড়বাল-রাজের প্রতিষ্ঠিত।

ইহার জন্য তাঁহাদের দত্ত গুঁট বা দেবত্র আছে। কেদারখণ্ডে এই মূর্তির কোন উল্লেখ নাই বরং এই সঙ্গমে স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত বলা হইয়াছে।

আমরা দেবপ্রয়াগে পৌছিতেই পাণ্ডা চন্দ্রাপ্রসাদের পুত্র, আমাদের কলিকাতার পরিচিত বৈজনাথ আসিয়া আমাদিগকে লইয়া গিয়া সঙ্গমে স্নান করাইলেন। সেখানে জলের ভীষণ আলোড়ন ও গর্জন। ভাগীরথীর ধারা কিছু পরিষ্কার, তাহার উপর অলকানন্দার ঘোলা জল উদ্দাম স্রোতে পড়িতেছে। স্নানের পর অনেক ধাপ সিঁড়ি উঠিয়া রামমন্দির দর্শন করিলাম। মন্দিরটি বৃহৎ ও সুন্দর। মন্দিরে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের মূর্তি আছে। ১৮৯৪ সালের গহনা প্লাবন নাকি এই মন্দিরের মেঝে পর্যন্ত উঠিয়াছিল। পঞ্চকেদার ও পঞ্চবদরীর মত পঞ্চপ্রয়াগও প্রসিদ্ধ আছে, যথা—দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দ-প্রয়াগ ও বিষ্ণুপ্রয়াগ। এগুলি অলকানন্দার সহিত ভাগীরথী প্রমুখ পাঁচটি নদীর সঙ্গমস্থল। ইহার মধ্যে আবার দেবপ্রয়াগ যাত্রীরা প্রথম পায় ও এখানে ভাগীরথীর সঙ্গম। তাই ইহার মাহাত্ম্য বেশী। সঙ্গমঘাটে অনেক যাত্রী মস্তক মুণ্ডিত করিয়া পিণ্ডদানাদি করিতেছেন। পাণ্ডাপুত্র আমাদিগকেও তাহা করিতে পীড়াপীড়ি করিল। আমরা বরাবর কুরুক্ষেত্র-গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাদি পিণ্ডদানের মুখ্য স্থান শুনিয়া আসিতেছি এবং তদনুসারে প্রয়াগের গঙ্গা ধরিয়া পাঁচ স্থানে পিতৃকৃত্য করিয়াছি। এ যাত্রায় শুধু বদরীধামে ব্রহ্মকপালে পিণ্ডদান করিবার সংকল্প করিয়াছিলাম তাই দেবপ্রয়াগে কিছু করিলাম না। পাণ্ডাদের এই পীড়াপীড়ির কারণ আমি বুঝি। ব্রহ্মকপালে বা বদরী ধামের অন্যত্র কোন তীর্থকার্যে পাণ্ডাদের হাত নাই। তাই তাঁহারা যাত্রীদের দ্বারা যত কিছু পারেন দেবপ্রয়াগে করাইয়া লন। এ সম্বন্ধে

পদ্মনাথ বাবুর অভিজ্ঞতা এইরূপ—"রাগে পাইলে পাণ্ডাজিরা গোদানও করাইয়া থাকেন। একটু গোবর হাতে দিয়া প্রয়াগ ঘাটের উপর সংস্কৃত মন্ত্র পড়াইয়া যজমানের অতর্কিতে গোদানের সংকল্প করাইয়া ফেলেন, তারপর তন্মূল্য আদায় করেন। আমাদের হাতে গোবর দিবামাত্রই ব্যাপার বুঝিয়া উহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দেই।" সময় সময় পাণ্ডাদের এরূপ অর্থলোভ দেখা যায় বটে, কিন্তু পাণ্ডাপ্রথা না থাকিলে আমাদের অনেক তীর্থ করা কঠিন হইত। তাই পদ্মনাথ বাবুও পরে বলিয়াছেন, "যদিও কোন কোন বিষয়ে পাণ্ডাদের উপর লোকে বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকে, তথাপি পাণ্ডাগণের যত্নে তীর্থের যে শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।"

পেট খারাপ ছিল বলিয়া দুপুরে আমি খাইলাম না। দরবার-এজেন্সীতে গিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর মালের কুলীর চিঠ্‌ঠি কাটান হইল। তখন সে অসুখের অজুহাতে তাহার বড় ভাই গিরিধারীকে বদল দিয়া নিজে বিদায় লইল। ইহাতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় নাই। গিরিধারীর নিকট জানিলাম তাহারা টিহরী-রাজ্যবাসী গৌড় ব্রাহ্মণ।

বিকাল তিনটায় দেবপ্রয়াগ হইতে বাহির হইলাম। পাণ্ডাপুত্র তাহার পূর্বে আসিয়া আমাদের নাম ধাম তাঁহার খাতায় লিখিবেন কথা ছিল, তাহা হইল না। পরে বদরীধামে স্বয়ং পাণ্ডা চন্দ্রাপ্রসাদ তাহা করেন। কেদারের পাণ্ডা কথামত দেবপ্রয়াগে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদের সঙ্গে চলিলেন। এদিকে পথ শুষ্ক ও ছায়াবিহীন, আর সমস্তদিন রৌদ্রে পোড়ে। তাই বিকালে চলিতে কষ্ট হইত। দেবপ্রয়াগ হইতে আমরা অলকানন্দার পূর্বতীর দিয়া চলিলাম। পথে অনেক চড়াই উৎরাই। দেবপ্রয়াগ হইতে এক মাইল পর একটি

ঝরণার পাশে বাগানের মধ্যে গোপালের মন্দির। তার তিন মাইল পর কলাসু চটি। ইহারই নিকট বোধ হয় বিদ্যাকুটি গ্রাম, যেখানে গড়বালরাজ-দত্ত-দেবত্রযুক্ত মুরলীমনোহর মন্দির আছে। তাহার পর তিন মাইল কিছু কঠিন পথ চলিয়া সন্ধ্যাকালে অলকানন্দার তীরে রাণীবাগ চটিতে পৌছিলাম ও এক দোকান ঘরের দোতালায় উঠিলাম। সমস্ত দিনের উপবাসে পেট ভাল হইয়াছিল, ভাত পাক হইলে খাইয়া নিদ্রা গেলাম।

রাণীবাগ—ভীলকেদার—শ্রীনগর—ভট্টিসেরা। ১৯ মাইল

(৯ই মে)

ভোরে রওনা হইয়া প্রায় দুই মাইল গিয়া কুলটা নামে ছোট চটি পাইলাম। এখান হইতে অলকানন্দার তীর ছাড়িয়া দিয়া এক নানাবল্কল মৃণ্ময় মালভূমিতে মাইল খানেক উঠিয়া রামপুর চটিতে চা খাইলাম। চটির কাছে একটি বড় গ্রাম। চারিদিকে আবাদ ও মাঝে মাঝে আম গাছ। এইখানে পথে ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায় প্রথম দেখিলাম। এখান হইতে মাইল দেড়েক পর পথের ধারে ও পর্বতশীর্ষে পাঁইন গাছ দেখা গেল। তার অল্প পর আমরা অলকানন্দার তীরে এক প্রশস্ত ও শস্যশালী জনপদে পড়িলাম। পথের দুধারে নেড়া সেজ, করমচা, কুল প্রভৃতি কাঁটা গাছে ঘেরা শস্যক্ষেত্র, মাঝে মাঝে আম গাছ এবং গ্রাম ও প্রাচীন দেবালয়সমূহ। গ্রা[illegible] হইতে বালকের দল বাহির হইয়া নাচিয়া গান গাইয়া আমাদি[illegible] ভিক্ষার জন্য ধরিতে লাগিল। যতদূর বুঝা গেল গানগুলি এইরূপ—

(১) রাজা খাবে হালুয়া পুরি,
বরফি মাঙ্গায়কে।

যোগী খাবে রুখা সুখা,

ধুনি জ্বালায়কে।

তুলসী মগন ভয়ে,

রামগুণ গায়কে ॥

(২) রাজা বসে খাট গদ্দি,

সতরঞ্চ বিছায়কে।

যোগী বসে মৃগছালে,

ধুনি জ্বালায়কে।

তুলসী মগন ভয়ে,

রামগুণ গায়কে ॥

(৩) রাজা চলে ডাণ্ডি ঘোড়া,

পালকি মাঙ্গায়কে।

যোগী চলে নঙ্গা পায়ের,

চিমটা বাজায়কে।

তুলসী মগন ভয়ে,

রামগুণ গায়কে ॥

এই ভাবে মাইল তিনেক চলিয়া ভীলগঙ্গার পুল পার হইয়া উহার উচ্চ তটে ভীলকেদারের মন্দির পাইলাম। বিগ্রহের এই নাম এবং পথের নৃত্যগীত-রত বালকদের ময়লা রং ও ছিপছিপে চেহারা দেখিয়া মনে হয় যে লোভা পর্যন্ত এই অঞ্চলই কেদারখণ্ডে উল্লিখিত ভীল্লক্ষেত্র।

ভীলকেদারের মন্দিরটি ছোট কিন্তু প্রাচীন ও সুন্দর। ইহাকে বাড়াইবার জন্য পূজারি কিছু পাথর সংগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু উহা লাগাইলে মন্দিরের মাহাত্ম্য বা সৌন্দর্য বাড়িবে কিনা সন্দেহ। ভীলকেদার হলুদ রং-এর স্বাভাবিক প্রস্তর শৃঙ্গ, উহাতে ত্রিবলীর মত

wave-mark আছে। মন্দিরের বাহিরে এক অতি বৃহৎ পদচিহ্ন পাথরে খোদা আছে। কিরাতার্জ্জুনের উপাখ্যান অনুসারেই বোধ হয় ইহাকে অর্জুনের পদচিহ্ন বলা হয়। মন্দিরের চারিদিকে প্রাচীন মূর্তির খণ্ড সকল পড়িয়া আছে। আরও নাকি ছিল, তাহা ১৮৯৪ সালের গহনা হ্রদ প্লাবনে বহিয়া গিয়াছে। ভীলকেদারের পূজারি নাকি গোঁসাই সম্প্রদায়ের। মন্দিরের সংলগ্ন স্থায়ী বসতি। তাহাতে রূপার গহনা প্রস্তুত হইতেছে দেখিলাম।

ভীলকেদারের অপর পারে মার্ত্তণ্ডগঙ্গা নামে এক নদী অলকানন্দায় পড়িয়াছে। তাহার মাইল খানেক উজানে টিহরী রাজ্যের কীর্তিনগর নামে বিশিষ্ট সহর। মোটর সড়ক দেবপ্রয়াগ হইতে এই পর্যন্ত বাড়াইবার কাজ চলিয়াছে। কীর্তিনগর হইতে এপারে বৃটিশ রাজ্যে পারাপারের জন্য অলকানন্দার উপর এক লোহার পুল আছে, সেখান হইতে শ্রীনগর চারি মাইল। মাইল খানেক পর পথের ধারে নারদ মন্দির। এখানে নাকি কিছু দিনের জন্য নারদ ঋষি বানররূপ প্রাপ্ত হন। তারপর গরুড় মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, শীলরাজার কন্যার মন্দির, পথের বামদিকে অলকানন্দার তীরে দোভাল বৈষ্ণব মঠ* প্রভৃতি পড়িল। তারপর শ্রীনগরের পথ ছাড়িয়া বামদিকে নামিয়া আধ মাইল আন্দাজ চলিয়া আমরা কমলেশ্বরের মন্দিরে পৌছিলাম।

কমলেশ্বরের মন্দিরটি ক্ষুদ্র কিন্তু প্রাচীন। উহা বসতির মধ্যে এক প্রশস্ত চত্বরের মাঝখানে অবস্থিত। কেদারখণ্ডে আছে যে এখানে রামচন্দ্র শিবকে কমল অর্পণ করেন। কমলেশ্বর স্বাভাবিক প্রস্তর খণ্ড।

* The principal temples to Laksmi-Narayan are in Srinagar itself; the one known as Sankara Math was built by Sankara Dobhal in 1785 A. D. (*The Himalayan Districts*, II, p. 788.)

উহার সামনে পিত্তলের এক বৃহৎ বৃষমূর্তি আছে। চত্বরের চারিদিকে প্রাচীন মূর্তিসমূহ রক্ষিত আছে। এসকল দেখিয়া লইয়া আধ মাইল আন্দাজ চলিয়া আমরা শ্রীনগরের পথে উঠিলাম ও মাইল খানেক চলিয়া সহরে পৌছিলাম এবং কালিকমলি-বাবার বৃহৎ ধর্মশালায় স্থান লইয়া তথায় স্নানাহার করিয়া দুপুরে অবস্থান করিলাম।

শ্রীনগর একটি কেন্দ্রীয় স্থান। এখান হইতে হরদ্বার ৭৭ মাইল, টিহরী ৩৫ মাইল, কেদার ৫৯ মাইল, বদরী ১০৬ মাইল এবং পৌড়ী ও দুগড্ডা হইয়া কোটদ্বার ৬০ মাইল। শুনা যায় যে ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজা অজয় পাল শ্রীনগর স্থাপন করেন। তদবধি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৃটিশ অধিকার পর্যন্ত উহা সমগ্র গড়বাল রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই অঞ্চল রাজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। তাই ভীলকেদারের আগে হইতে আমরা পূর্ব সমৃদ্ধির অবশেষ—এত ক্ষেত, লোকালয় ও দেবালয় পাইলাম। কেদারখণ্ডে এ অঞ্চলকে শ্রীক্ষেত্র বলা হইয়াছে।

এখন আর শ্রীনগর রাজধানী নহে। এখান হইতে আট মাইল দক্ষিণে ৫৩৫০ ফুট উচ্চ মালভূমিতে স্থিত পৌড়ী গড়বাল জেলার হেড কোয়াটার্স। কিন্তু অন্য বিষয়ে এখনও শ্রীনগর এ অঞ্চলের প্রধান সহর। এখানে বাজারে স্থানীয় ও নজিবাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে আগত নানাবিধ দেশী ও বিদেশী দ্রব্য পাওয়া যায়। কেদার বদরী যাত্রীদের জন্য ডাণ্ডি কুলীরও ইহা একটি কেন্দ্র। এখানে হাসপাতাল, ডাকঘর, তারঘর, থানা প্রভৃতি আছে। শ্রীনগর অলকানন্দা নদীর তীরে ১৭৫৮ ফুট উচ্চে অবস্থিত। প্রাচীন সহর ১৮৯৪ সালে গহনা হ্রদের প্লাবনে নষ্ট হয়। তারপর তৎকালের ডেপুটি কমিশনর পউ সাহেবের কল্পনা মত বর্তমান সহর নির্মিত হইয়াছে।

এই গহনা হ্রদ প্লাবনের এক সুন্দর বর্ণনা পদ্মনাথ বাবু দিয়াছেন—

"১৮৯৪ সালের আগষ্ট মাসের এক দৈবী ঘটনা গড়বালের অনেক স্থানের বিশেষতঃ শ্রীনগরের ধ্বংশ সাধন করিয়াছে। শ্রীনগর হইতে প্রায় ৫০ মাইল উপরে বিরহিগঙ্গা নামে অলকানন্দার একটি উপনদীর সঙ্গম স্থান। ঐ সঙ্গমের ৫।৬ মাইল উজানে (বিরহিগঙ্গায়) একটি পাহাড় ধ্বসিয়া পড়ায় ১৮৯৩ সালের অক্টোবর মাসে নদীর জলস্রোতঃ অবরুদ্ধ হয়। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট একটা নালা কাটিয়া জলস্রোতঃ ক্রমশঃ নিঃসারিত করার চেষ্টা করেন—কেন না অবরোধ স্থানে প্রচণ্ড জলরাশি স্ফীত হইয়া জমিয়াছিল, উহার চাপে সহসা পর্বতগাত্র ভেদ হইলে বিরহিগঙ্গা ও ভাগীরথীর তীরবর্তী স্থানের লোকদের বিষম ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। গভর্ণমেণ্টের নালা কাটিবার চেষ্টা বিফল হয়। তখন গভর্ণমেণ্ট নোটিস দিয়া অধিবাসীদিগকে নদীর তীর হইতে অন্ততঃ ২০০ ফিট সরিয়া বাস করিতে আদেশ দেন, এবং পাহাড় ভেদ হইলে তারযোগে নানা স্থানে সংবাদ দিবার জন্য ঐ স্থান পর্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন বসান।

"১৮৯৪ সালের ২৫শে আগষ্ট রাত্রি দুই প্রহরের সময় সহসা প্রবল বেগে জলরাশি নির্গত হইয়া দুই কূল ভাসাইয়া চলিল—গভর্ণমেণ্টের কৃত সাবধানতায় লোকের জীবন ও অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষা হইল বটে কিন্তু পাকা কাঁচা মোকাম তাবৎ মুহূর্তে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ভাসিয়া গেল—শ্রীনগর একেবারে শ্মশানে পরিণত হইল। কেবল কমলেশ্বরের মন্দির এই বিপ্লবের মধ্যেও টিকিয়া রহিল।"

কয়েকদিন ধরিয়া ডাণ্ডির কুলীরা আমাদের কাছে কাঁধে রাখিবার জন্য গামছা বকশিশ্ চাহিতেছিল। সেদিন উহা কিনিতে শ্রীনগরের বাজারে গিয়া এক অভিনব ব্যাপার ঘটিল। কয়েক দোকান ঘুরিয়া যে দোকানীর নিকট গামছা কিনিলাম তাঁহার কথাবার্তায় জানা গেল যে তিনি বিখ্যাত চিত্রকর মোলারামের প্রপৌত্র, নাম বালকরাম।

মোলারামের অঙ্কিত অনেক চিত্র প্রবাসী পত্রিকায় দেখিয়াছি। তিনি জীবিত কি মৃত তাহা জানিতাম না। কোন দিন যে তাঁহার বংশধরের সহিত সাক্ষাৎ হইবে ইহা কল্পনা করি নাই। বালকরামের নিকট শুনিলাম যে তাঁহারা তোমর বংশীয়। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ শ্যামদাস আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে দিল্লী হইতে কার্য-সূত্রে গড়বাল রাজদরবারে আসিয়া শ্রীনগরে বাস স্থাপন করেন। তাঁহার পৌত্র, কবি ও চিত্রকর মোলারাম ১৭৫০ হইতে ১৮৩৩ সাল, অর্থাৎ বৃটিশ অধিকারের পর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ও শ্রীনগরে বাস করিতেন। তাঁহার পৌত্র তেজরাম দুরবস্থায় পড়িয়া এই দোকান খোলেন। বালকরাম তেজরামের পুত্র. আর বালকরামের পুত্র বৈজরাম এখন লক্ষ্ণৌ আর্ট-স্কুলে চিত্রাঙ্কণ শিখিতেছে। মোলারাম সম্বন্ধে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহ ও তাঁহার ১৮১২ সালে অঙ্কিত দোঁহাসহ দশমহাবিদ্যা, নবগ্রহ প্রভৃতির অপ্রকাশিত ছবি বালকরাম আমাদিগকে দেখাইলেন। সেই সুদূর বিদেশের পার্বত্য বাজারের মধ্যে বসিয়া চিত্রগুলি দেখিয়া ও চিত্রকরের বংশধরের সহিত আলাপ করিয়া আমাদের মন যেন ভরিয়া গেল। সেই সঙ্গে হতশ্রী শ্রীনগরের অতীত সম্পদের কথা মনে হইল।

বালকরামের নিকট শুনিলাম যে একবার কবিবর রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে তিনি মোলারামের চিত্রসহ তাঁহার সহিত কলিকাতায় সাক্ষাৎ করেন। বাস্তবিক, এই কথা হইতেই আমাদের আলাপ আরম্ভ হয়। মনে হইল সমগ্র ভারতে কোন্ প্রদেশে বাঙ্গলার মত এত গুণী ও গুণগ্রাহীর আবির্ভাব হইয়াছে? তবু বাঙ্গলার আজ এ দশা।

বিকাল চারিটায় শ্রীনগর হইতে রওনা হইয়া, চারি মাইল পর সুক্কতা নামে ক্ষুদ্র চটি পার হইয়া মাইল খানেক গিয়া আমরা অলকানন্দার তীর ছাড়িয়া দিয়া পাইন বৃক্ষমণ্ডিত উচ্চভূমিতে উঠিলাম।

পথে হইতে দেখা গেল অলকানন্দায় কাঠের স্লিপার ভাসাইয়া নামান হইতেছে। কয়েকটি ঝরণা পার হইয়া তিন মাইল চলিয়া ভট্টিসেরা চটিতে রাত্রের মোকাম করিলাম। কালিকমলি-বাবার ধর্মশালা যাত্রীতে পূর্ণ দেখিয়া এক দোকান ঘরে উঠিলাম। হর্ষবতী নামে ঝরণার জল ঘুরাইয়া আনিয়া তাহার সাহায্যে চাক্কি চালাইয়া ঐ ঘরের নীচেই আটা পিষা হইতেছে। এইরূপে পাহাড়ি নদীর সাহায্যে মিল চালাইয়া গম প্রভৃতি পিষা ও ঘূর্ণিত অস্ত্রের সাহায্যে নরম কাঠ খুদিয়া পাত্র তৈয়ার করার প্রথা কাশ্মীর হইতে দার্জিলিং পর্যন্ত হিমালয়ের সমস্ত প্রদেশে চলিত আছে। এ অঞ্চলে কাঠের বাসন তৈয়ারির প্রধান স্থান গুপ্তকাশীর উত্তরে ব্যুঙ্গ ও রামপুর চটি এবং তুঙ্গনাথের নিকট চোপতা।

ভট্টিসেরা—রুদ্রপ্রয়াগ—রামপুর। ১১+৭ মাইল

(১০ই মে)

সামনে এক এক মাইলের তিনটি চড়াই ও তাহার সঙ্গে উৎরাই পড়িবে বলিয়া খুব ভোরে ভট্টিসেরা হইতে রওনা হইলাম। এক মাইল চড়াই উঠিয়া ও এক মাইল কতকটা সমান পথ চলিয়া ছান্তিখাল নামে ক্ষুদ্র চটি। এখানে পট্টবতী নামে ঝরণার উপর পাথরের গরুড় মূর্তি স্থাপিত আছে। সেখান হইতে এক মাইল চড়াই উঠিয়া ও মাইল দেড়েক অসমান উচ্চ ভূমিতে চলিয়া এক ঝরণার ধারে নরকোটা চটি। সেখান হইতে তৃতীয় চড়াই এক মাইল উঠিয়া পঞ্চ-ভাইখেল নামে পাহাড়ের মাথায় পৌছা গেল। এখানে একটি পিয়াও আছে, আর পর্বতমালার মধ্যদিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া অলকানন্দা আসিতেছে দেখা গেল। আড়াই মাইল পর গুলাবরায় চটি।

এখানে প্রচুর জল আছে, কিন্তু স্বাদ লবণাক্ত। এই চটিতে প্রথম দেখিলাম যে এক ভুটিয়া পরিবার নীচের অঞ্চলে শীতকাল যাপন করিয়া দেশে ফিরিবার পথে ডেরা খাটাইয়া দোকান বসাইয়াছে। মাইল খানেক আগে এক আমবাগানের মধ্য দিয়া অলকানন্দার অপর তীরে রুদ্রপ্রয়াগ সহর দেখা গেল। তারপর একটি ছোট নদী ও অলকানন্দা পার হইয়া তথায় পৌছিলাম। অলকানন্দার পুলের এপার হইতে বদরীর পথ উহার ধার দিয়া পূব মুখে গিয়াছে। কেদারের পথ রুদ্রপ্রয়াগ হইতে মন্দাকিনীর ধার দিয়া উত্তর মুখে গিয়াছে। এখান হইতে হরদ্বার ৯৫ মাইল, কেদার ৪৮ মাইল ও বদরী ৮৮ মাইল, কর্ণপ্রয়াগ ২১ মাইল। রুদ্রপ্রয়াগ বৃটিশ অধিকারে স্থিত। রুদ্রপ্রয়াগে কালিকমলি-বাবার ধর্মশালায় যাত্রীর ভিড় দেখিয়া পাণ্ডা লক্ষ্মীনারায়ণের নির্দেশমত একটু উপরে গিয়া রুদ্রেশ্বরের মন্দিরের সংলগ্ন যাত্রী-নিবাসে স্থান পাইলাম। এই মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক স্বামী সচ্চিদানন্দের সহিত আলাপ হইল। তিনি জন্মান্ধ, কিন্তু শুনিলাম দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে সম্মানিত। তাঁহার চেষ্টাতে এই যাত্রী-নিবাস নির্মিত হইয়াছে ও রুদ্রেশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গন পাথরে বাঁধা হইয়াছে এবং একটি সংস্কৃত পাঠশালা চলিতেছে।

দেবপ্রয়াগের মন্দিরের মত, রুদ্রপ্রয়াগের মন্দিরও সঙ্গমের অনেকটা উপরে স্থিত। মন্দিরটি প্রাচীন। উহার সামনে একটি প্রশস্ত খোলা জগমোহন আছে। কেদারখণ্ডে এই সঙ্গমকে সূর্যপ্রয়াগ বলা হইয়াছে, লিঙ্গের কোন উল্লেখ নাই। রুদ্রেশ্বর প্রস্তর-নির্মিত লিঙ্গ। তাহার পিছনে মন্দির কোণে একটি পিত্তলের সুন্দর দণ্ডায়মান শিবের মূর্তি ও শালগ্রাম পড়িয়া আছে। এ স্থানের উচ্চতা ১৯৮০ ফুট।

মন্দির প্রাঙ্গন হইতে নীচে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম

দেখা যায় ও গর্জন শুনা যায়। মন্দাকিনীর ওপারে টিহরী রাজ্য। পারাপারের জন্য একটি দড়ির ঝুলা আছে। আমরা স্নানের জন্য সঙ্গমে নামিয়া গেলাম। মন্দাকিনীর স্রোত পরিষ্কার, তাহার উপর অলকানন্দার ঘোলা জল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ঘাটে দৃঢ়লগ্ন লোহার শিকলের সাহায্যে আমরা স্নান করিয়া, অর্দ্ধপথে অবস্থিত একটি ছোট মন্দিরে কালী দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলাম এবং পাক ও আহার সারিয়া বিশ্রাম করিলাম। এখানে তুঙ্গনাথের এক পাণ্ডা ক্ষেমানন্দ নিত্যানন্দ দেখা করিয়া আমাদের তুঙ্গনাথের পাণ্ডা নিযুক্ত হইয়া গেল।

বিকাল তিনটায় আমরা কেদার অভিমুখে রওনা হইলাম। মন্দাকিনীর কিনারা দিয়া উত্তর মুখে পশ্চিমের টানা রৌদ্রে চলিতে হইল। তিন মাইল খাড়াই ও এক মাইল কতক সহজ পথ চলিয়া এক ছোট চটি ও তাহার মাইলখানেক পর ছতোলি চটি পাইলাম। এখানে ঝরণা ও জলের নল আছে। তার দেড় মাইল পর আম গাছের ছায়ায় মঠচটি। তাহা ছাড়িয়া এক মাইল অগ্রসর হইয়া মন্দাকিনী-তীরে রামপুর চটি পাইলাম এবং একটি দোকান ঘরে পাক করিয়া খাইয়া রাত্রে অবস্থান করিলাম। রামপুরে স্থায়ী বসতি ও গরুড় প্রভৃতির ছোট ছোট মন্দির আছে। প্রথম এখানে রাত্রে ঠাণ্ডা পাওয়া গেল।

রুদ্রপ্রয়াগ সঙ্গমে অলকানন্দার সামনে মন্দাকিণী মন্দা বটে, কিন্তু উপরে তাঁহার অন্য রূপ। পদ্মনাথ বাবুর কথায়, "এই পথ মন্দাকিনীর কলকল ধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছে। তাই মনে হইত নামটি 'মন্দাকিনী' না হইয়া 'কোলাহলিনী' হইলে শোভন হইত। এই মন্দাকিনীর তীরেই কেদারনাথের পুরী অবস্থিত।"

এই পথে চলিতে স্থানে স্থানে পর্বতগাত্রে টিলা conglomerate এবং স্তরবিন্যস্ত পাথর দেখিলাম। ইহাতে বিভিন্ন যুগের অবস্থা দেখা

যায় এবং আদিকালের এক মহানদ হইতে হিমালয় পর্বত উত্থিত হইয়াছে—পণ্ডিতদের এই সিদ্ধান্তের নিদর্শন পাওয়া যায়।

রামপুর—অগস্ত্যমুনি—চন্দ্রপুরী—কুণ্ড চটি। ১৫ মাইল

(১১ই মে)

ভোরে রামপুর চটি হইতে বাহির হইয়া মাইল দুই চলিয়া সোরগড় ডাকবাঙ্গলার নিকট মন্দাকিনীর উচ্চ তীরে পাইন গাছের বন পার হইয়া এক মাইল পর একটি ঝরণার উপর পানিচাকি পাইলাম। তাহার পর মাইলখানেক গেলে অগস্তমুনির গ্রাম দেখা গেল। সামনে নদীর তীরে প্রকাণ্ড সমতল ভূমি—যেন "ক্রিকেট বা পলো খেলিবার মাঠ"। কয়েক বৎসর হইল এখানে এরোপ্লেন নামিতেছে। এই বৎসর বৈশাখ মাসে এই মাঠে এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন দেখিলাম।

তুঙ্গ বা পেঙ্গে গাছের বীথির মধ্যদিয়া আমরা গ্রামে পৌছিলাম। এখানে স্থায়ী বড় বসতি। নানা দ্রব্যের দোকান ও ডাকঘর আছে। এরোপ্লেনে আগত যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য কয়েকখানি ডাণ্ডিও পড়িয়া আছে। কমলেশ্বরের ন্যায় অগস্ত্যের মন্দির ক্ষুদ্র এবং বসতির মাঝখানে এক চত্বরের মধ্যে অবস্থিত। ইহা প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। কেদারখণ্ডে অগস্ত্যেশ্বর ও মুনিশ্বর দুইটি লিঙ্গের উল্লেখ আছে। উহা যোগ করিয়া বোধ হয় মূর্তির ও স্থানের বর্তমান নাম সৃষ্ট হইয়াছে।

অগস্ত্য ফুট চারেক উচ্চ অষ্টধাতুর সুন্দর মূর্তি। কাপড় পরান ছিল বলিয়া অবয়ব বুঝা গেল না। দুই হাতে দুইটি পদ্ম। ডান হাতের কনুই হইতে ৭ আকারের তরবারি ঝুলিতেছে। আমরা পরে গোপেশ্বরের ত্রিশূলেও এই আকৃতির তরবারি দেখি। বুকে দুইখানি

চকচকে ছোরা গোঁজা। মূর্তির দক্ষিণে ও বামে সুদর্শন ও বিন্ধ্যাচল নামে দুইটি সুন্দর পার্শ্ব-দেবতা ও বাম হাতের কাছে শৃঙ্গী নামে আর একটি সুন্দর অষ্টধাতু-মূর্তি, যাহার হাতে বল্লম ও মাথায় দুইটি শৃঙ্গ। এইগুলি বৌদ্ধ দেব-মূর্তি বলিয়া মনে হইল। এখানে পূজারি বিজবাল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পদ্মনাথ বাবুও অগস্ত্যের মূর্তি সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া লিখিয়াছেন, "এখানে এক মন্দিরের মধ্যে মুনিবরের বিশাল মূর্তি স্থাপিত—আবার অস্ত্র-শস্ত্রও আছে। এখানে এ তপস্বীকে কি জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে হইল, বুঝিলাম না। এই আশ্রম বোধ হয় অগস্ত্যের প্রথমাবস্থার বা সাধন সময়ের—নচেৎ তাঁহার আশ্রম বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণ-বর্তী বলিয়াই প্রসিদ্ধ।" সিষ্টর নিবেদিতা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পুরাকালে হ্রদ শুকাইয়া এখানকার সমতল ক্ষেত্র হইয়াছে ও তাই কাশ্মীর উপত্যকার মত ইহার সহিত সমুদ্রপায়ী অগস্ত্যের নাম সংযুক্ত হইয়াছে। অগস্ত্যের সামনে রামচন্দ্রের গদি। চত্বরের নানাস্থানে নানা মূর্তি বিরাজ করিতেছে। "In the porch there is an image of Narasinha. In some of the chapels there are plaques and masks of the Nine Planets, of Narada, of Ganesa and of old Buddhist carvings. Some one bought here the head of a stone Bodhisatva." (*The Northern Tirtha*, p. 32)

অগস্ত্যমুনি ছাড়িয়া পথের দুধারে পাথরের নুড়ির নির্মিত আইলের মধ্যদিয়া চলিলাম। এইরূপ আইল গড়বালের সীমান্ত পর্যন্ত দেখিয়াছি। মাইল দুই অগ্রসর হইলে বেডকসর গ্রামের সম্মুখে পাণ্ডাজি মন্দাকিনীর অপর পারে একটি রুদ্রাক্ষ গাছের বাগান দেখাইলেন। খানিক পরে সৌড়িচটি ও একটা ঝরণা পার হইলে পাণ্ডাজি বলিলেন যে এখান

হইতে বৃটিশ সীমানা মন্দাকিনীর পশ্চিম পারে গিয়াছে। তথা হইতে আধ মাইল চলিয়া একটি নদী পার হইয়া আমরা চন্দ্রপুরী চটিতে পৌছিলাম।

চন্দ্রপুরী মন্দাকিনীর তীরে অবস্থিত। চটির মধ্যদিয়া পানিচাক্কির নালা বহিতেছে। গড়বাল-রাজের পুরোহিতবংশীয় চন্দ্রমণি ডাঙ্গবাল এখানে একটি মুরলীমনোহর মন্দির স্থাপন করেন। তাঁহার নাম হইতে গ্রামের নাম। এ চটিতে সব দ্রব্য পাওয়া যায়। এখানে প্রথম মাছির উপদ্রব পাইলাম। আমরা এক দোকান ঘরে উঠিয়া পাক করিয়া খাইলাম। এখানে সাবান কিনিয়া দশ বার দিনের ব্যবহারে ময়লা কাপড় ধোয়াইয়া শুকাইয়া লওয়া হইল।

বিকালে চন্দ্রপুরী হইতে বাহির হইয়া মাইল দুই পর বাঁশবারা ঝরণা ও আর এক মাইল পর ভীরি নামে বড় চটি পাইলাম। এই চটির মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ ও গভীর খাতে মন্দাকিনীর ধারা বহিতেছে। লোহার পুলে উহা পার হইয়া মন্দাকিনীর পশ্চিম তীর ধরিলাম। কেদার-পুরী পর্যন্ত পথ এই তীরেই থাকিবে। পাহাড় ধ্বসিয়া যাওয়ায় খানিক দূর পথ খারাপ পাওয়া গেল। মাইল দেড়েক পর এক ঝরণার ধারে কুণ্ডিয়া নামে ক্ষুদ্র চটি ও তাহার কাছে বটওয়ালচরি ডাকবাঙ্গলা। তার মাইল দেড়েক পর মন্দাকিনীর তীরে কুণ্ড চটিতে পৌছিয়া এক দোকান ঘরে পাকশাক করিয়া রাত্রি যাপন করিলাম। এখানে আমরা উচ্চ পার্বত্য-ভূমিতে পড়িলাম ও শীত পাইতে লাগিলাম। কেদার ও বদরী দর্শন করিয়া জোষিমঠে ফেরা পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল।

কুণ্ডচটি—গুপ্তকাশী—ব্যুঙ্গ—রামপুর। ১৪ মাইল

(১২ই মে)

ভোরে পাজামা ও গরম কাপড় পরিয়া বাহির হইলাম। নিকটে একটি ঝরণা পার হইয়া দেড় মাইল খাড়া চড়াই উঠিয়া ও আধ মাইল

প্রায় সমান পথে চলিয়া গুপ্তকাশী সহরে পৌছিলাম। কুণ্ডচটিতে আমরা মন্দাকিনীকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। চৌদ্দ মাইল পর সোম-প্রয়াগে আবার উহার দেখা পাইব।

গুপ্তকাশী এ অঞ্চলের একটি প্রধান স্থান। এখানে স্থায়ী ডাকঘর ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে এবং দেশী বিদেশী নানা প্রকার দ্রব্য ও যাত্রা-সম্বন্ধীয় বই ও চিত্র প্রভৃতি পাওয়া যায়। গুপ্তকাশীর দক্ষিণে মন্দাকিনীর অপর পারে কেদারের রাওল সাহেবের বাসস্থান প্রসিদ্ধ উখিমঠ সহর। গুপ্তকাশীর মাইল তিন পশ্চিমে পাহাড়ের উপরে পৌরাণিক বাণ অসুরের রাজধানী বলিয়া কথিত শোণিতপুর গ্রাম, কেদারের পাণ্ডাদিগের বাসস্থান। এই তিনটি প্রধান স্থানের কথা পরিশিষ্টে আলোচনা করিব। আমাদের পাণ্ডা লক্ষ্মীনারায়ণেরও বাড়ী শোণিতপুরে। শীতকাল হইতে কলিকাতায় থাকায় সে তিন মাস বাড়ী ছাড়া, তথাপি বাড়ী গেল না। লোক পাঠাইয়া গরম কাপড় আনাইয়া লইল এবং গুপ্তকাশীতে আমাদের মন্দিরাদি দর্শন করাইয়া কেদার-পুরীতে চলিল। সেখানে দর্শনাদি করাইয়া আমাদের সঙ্গে ফিরিয়া বাড়ী গিয়াছিল।

গুপ্তকাশীতে কালিকমলি-বাবার ধর্মশালায় ডাণ্ডি রাখিয়া আমরা মন্দির চত্বরে নামিলাম। কমলেশ্বর ও অগস্ত্যমুনির মত, গুপ্তকাশীতেও মন্দির-চত্বর বসতির মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু মন্দিরটি বড় এবং অন্য ধরণের। *কেদার-খণ্ডে এখানের শিবলিঙ্গের নাম সিদ্ধেশ্বর এবং গঙ্গা ও যমুনার গুপ্ত ধারার উল্লেখ আছে। বর্তমানে কাশীর মত এখানেও প্রধান বিগ্রহের নাম বিশ্বেশ্বর, তাঁহার মন্দিরের পাশে আধুনিক পার্বতী মন্দির। উভয়ের সম্মুখে কাশীর অনুকরণে মনিকর্ণিকা নামে কুণ্ড, তাহারই সন্নিকটে 'গুপ্তদানে'র স্থান। চত্বর ঘিরিয়া প্রকোষ্ঠে নানা প্রস্তর মূর্তি ও এক অংশে খাবারের দোকান রহিয়াছে।

আমরা প্রথমে মনিকর্ণিকা কুণ্ডে স্নান করিলাম। এখানে পিতলের গজমুখ হইতে যমুনা এবং ঐরূপ বৃষমুখ হইতে গঙ্গা নামে দুইটি ধারা পড়িতেছে। স্নানান্তে বিশ্বনাথ-মন্দিরে গেলাম। মন্দিরটি উচ্চ ও সুদৃশ্য। দরজার দুই পাশে দুইটি লাল পাথরের সুন্দর চতুর্ভুজ মূর্তি গাঁথা আছে। বিশ্বনাথ স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর শৃঙ্গ। উহার পশ্চাতে রূপার মুখস এবং তাহার পশ্চাতে অন্নপূর্ণার প্রস্তর মূর্তি স্থাপিত। মুখসের প্রথা এই মন্দিরে প্রথম লক্ষ্য করিলাম। বিশ্বনাথের পূজারি দক্ষিণ-দেশীয় জঙ্গম। তিনি উখিমঠের রাওল সাহেবের অধীন। বিশ্বনাথ-দর্শন করিয়া পার্বতী মন্দিরে গেলাম। ইহাতে প্রধান বিগ্রহ সাদা মার্বেল পাথরের অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি। তাহার এক পাশে বদরীনারায়ণ ও অপর পাশে লক্ষ্মী। ইহার পূজারি স্থানীয় ব্রাহ্মণ। চত্বরের এক কুঠরিতে নাগ-মূর্তিযুক্ত প্রস্তর-ফলককে নাগরাজ এবং অন্য এক কুঠরিতে কতকগুলি প্রস্তর মূর্তিকে পঞ্চপাণ্ডব নাম দিয়া রাখা হইয়াছে।

মন্দির চত্বরের খাবারের দোকানে আমরা নিজেরা জলযোগ করিয়া ও কুলীদিগকে জলযোগ করাইয়া আগে চলিলাম। এক মাইলের মধ্যে নলা চটি পাইলাম। এখান হইতে এক শাখা-পথ মন্দাকিনীর দিকে নামিয়া গিয়াছে এবং ওপারে উখিমঠ ও তুঙ্গনাথ হইয়া ত্রিশ মাইল দূরে অলকানন্দার উপর চমোলিতে হরদ্বার-জোষিমঠ পথে মিলিয়াছে। নলা চটির চৌধুরীর হেপাজতে অতিরিক্ত মাল রাখিয়া আমরা কেদারের দিকে চলিলাম।

নলা চটিতে ছোট বড় কয়েকটি সুন্দর প্রাচীন মন্দির আছে। সব গুলিই জীর্ণ ও অনাদৃত।* প্রধান মন্দিরের বিগ্রহকে ললিতাদেবী

* Here is Nalla Chatty with a temple which contains ancient Saivite remains together with relics of the great age in sculpture,

বলা হয়। কেদার-খণ্ড অনুসারে এ স্থানের নাম নলকুণ্ড, আর নল এখানে তপস্যা করেন।

নলা চটিতে অষ্টধাতু নির্মিত ছাঁচের উপর তামার পাতা পিটিয়া কেদার বদরী প্রভৃতির প্রতিমূর্তি তৈয়ার হইতেছে এবং লোহা ও তামার বলয় বিক্রয় হইতেছে। উপরের তুলনায় এখানে উহাদের দাম খুব কম। কেদার হইতে ফেরার পথে আমরা উহা কিছু কিনি।

নলা চটি পার হইতেই কেদার প্রত্যাগত যাত্রীদের সহিত সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। আরও একটু আগে ক্ষেতের মধ্যে একটি সুন্দর মন্দির ও তাহার নীচে খাদে বাঁধান ঝরণা দেখিলাম। তাহার পর দুই চারিটি দোকান ঘর পার হইলে একটা সরু পথ কালীমঠের দিকে নামিয়া গিয়াছে। কয়েক দিন পরে এই পথেই আমরা কালীমঠ হইতে ফিরি। মাইলখানেক পর ভেতা বা নারায়ণ-কুটি চটিতে কয়েকটি সুন্দর প্রাচীন মন্দির দেখিলাম। তাহাদের জীর্ণ অবস্থা।* প্রধান মন্দিরের বিগ্রহ নাকি ভেতা দেবী। ইনিই বোধ হয় কেদারখণ্ডে রাজরাজেশ্বরী বলিয়া উল্লিখিত। আমরা ফেরার পথে ভেতার মন্দির দেখিব মনে

Bodhisatvas and the rest. But the great thing is a memorial of some kind, perhaps a Jayastambha or Kirtistambha, as the people themslves suggest, which is evidently a curiously modified Buddhistic Stupa". (*The Northern Tirtha*, p. 36)

* Here there are two temples standing together on the road-side, and an immense cluster on the opposite side. The two on the road itself are the older. One, the older of these again, is to Satya-Narayan. The other is to Birbhadra or Siva. On the other side of the road, the main temple is to Laksmi-Narayan, and this adjoins a tank which has no less than seven small temples on its sides. Altogether the small shrines dotted about here are twenty." (*The Northern Tirtha*, p. 39)

করিয়াছিলাম কিন্তু কালীমঠ হইয়া আসায় তাহা হইল না। শ্রীনগরের মত এ অঞ্চলেও আমরা পূর্ব সমৃদ্ধির অবশেষ—প্রাচীন দেবালয়, বাঁধান জলাশয় প্রভৃতি দেখিলাম।

ভেতা বা নারায়ণ-কুটিতে 'উত্তরাখণ্ড-তীর্থসুধার-সভা'র অফিস। উহাতে বাস্তবিক কি সংস্কার কার্য হইতেছে বুঝিলাম না। তবে উহার 'মন্ত্রী' শ্রীযুক্ত বিশালমণি শর্মা হিন্দীতে উত্তরাখণ্ডের ম্যাপ ও পথদর্শিকা এবং গড়বাল-বৈভব কাব্য প্রভৃতি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার প্রাপ্তিস্থান 'বিশাল কার্যালয়', নারায়ণ-কুটি, পোষ্ট গুপ্তকাশী, জেলা গড়বাল।

ভেতা ছাড়িয়া মাইলখানেক গেলে এক অস্পষ্ট পথ পূবে কালীমঠের দিকে গিয়াছে। আমরা কয়েকদিন পর কেদার হইতে ফিরিয়া এই পথে কালীমঠ যাই। ইহার পর এক মাইল উৎরাই নামিয়া এক ঝরণার উপর ছোট ব্যাঙ্গচটি পাইলাম। এখানে জলের স্রোতে মিল চালাইয়া ঘূর্ণিত অস্ত্রের সাহায্যে কাঠ খুঁদিয়া বাটি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। এখান হইতে আধ মাইল উঠিয়া আমরা ব্যাঙ্গ চটিতে এক দোকান ঘরে দুপুরের মোকাম করিলাম। এই চটির এক দোকানে উত্তরাখণ্ড-যাত্রার ম্যাপ পাই।

বিকালে বাহির হইয়া এক মাইল চড়াই উঠিয়া মৈখণ্ডা গ্রামে মহিষমর্দিনীর মন্দির পাইলাম। মৈখণ্ডা প্রাচীন স্থান। ইহা হইতে পরগণার নাম হইয়াছে। দেবীর মন্দিরটি ছোট, এবং মূর্তি বস্ত্রালঙ্কারে ঢাকা। সামনে নানা নামে পিত্তল ও রূপার মুখস রাখা আছে। চণ্ডীপাঠেরও ব্যবস্থা আছে। পূজারী স্থানীয় ব্রাহ্মণ। সামনে এক উচ্চ দোলনা আছে। যাত্রীরা দর্শনান্তে ইহাতে দোল খাইয়া যায়।

আমরা তাহা করিয়া চলিলাম ও দুই মাইল পর গণেশের মন্দির ও

ঝরণা পাইলাম। তাহার তিন মাইল পর কাটা নামে চটি। ইহারই নিকটে গৌড় ব্রাহ্মণদের এক প্রধান কেন্দ্র রবিগ্রাম। কাটার পর এক ডাকবাঙ্গলা ও দুইটি ঝরণা পার হইয়া তিন মাইল দূরে বদলপুর চটি। তার পর মাইল খানেক চড়াই ও মাইল খানেক সমান পথ চলিয়া আমরা রামপুর চটিতে পৌছিলাম এবং কালিকমলি-বাবার ধর্মশালায় উঠিলাম। এখানে গড়বালীদের স্থায়ী বড় বসতি আছে। ঘর বন্ধ হইলেও রাত্রে বেশ শীত লাগিল।

এখানে আসিবার সময় পথে কাশীরাম বৈজরাম নামে ত্রিযুগীর এক অল্পবয়স্ক পাণ্ডা আমাদের সাথ ধরিল। সেই পরদিন ত্রিযুগীতে আমাদের পাণ্ডা হইবে ঠিক হইল।

রামপুর—ত্রিযুগী—সোমপ্রয়াগ—গৌরীকুণ্ড—রামবাড়া। ১৪ মাইল (১০ই মে)

সোজা পথে রামপুর হইতে গৌরীকুণ্ড পাঁচ মাইল। কিন্তু আমরা ত্রিযুগী হইয়া যাইব বলিয়া আমাদের আরও পাঁচ মাইল পথ ও অনেকটা চড়াই বেশী হইবে। তাই মালবাহক গিরিধারীকে পাণ্ডা লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত সোজা গৌরীকুণ্ড যাইতে বলিয়া আমরা ভোরে ডাণ্ডিতে রওনা হইলাম। মাইল দেড়েক পর একটা ঝরণা পাওয়া গেল তাহাতে দুইটি চাকি চলিতেছে—একটিতে কাঠ খোদাই হইতেছে ও একটিতে আটা পিষা হইতেছে। এই থানে—রুদ্রপ্রয়াগ হইতে ৩৭ মাইল ৪ ফার্লং এর পাথরের কাছে, গৌরীকুণ্ডের পথ ছাড়িয়া বামে ত্রিযুগীর পথ ধরিলাম এখানে এক প্রস্তর-ফলকে লেখা আছে যে কলিকাতার এক ভক্তিমান যাত্রী—পরে শুনি, ইনি বলদেব দাস বাজোরিয়া—১৯৩৭ সালে সাত হাজার টাকা ব্যয়ে ত্রিযুগীর তিন মাইল পথ করিয়া দিয়াছেন। মাইল খানেক

চড়াই উঠিলে পথের এক শাখা ডাইনে সোমপ্রয়াগে নামিয়া গিয়াছে। এখান হইতে দূরে নবোদিত সূর্য-কিরণে উদ্ভাষিত কেদারের উপরের তুষার শৃঙ্গ দেখা গেল। তাহার আধ মাইল পর চড়াইয়ের মাথায় শাকম্বরীর ক্ষুদ্র মন্দির।

"শাকম্বরী—দুর্গার রূপান্তর"। মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ে ইহার কথা আছে। মন্দিরটি ছোট—শাকম্বরী, দ্রৌপদী, নয়খানি নবদুর্গা, মৎসেন্দ্র প্রভৃতি নানা নামের ধাতুময় মুখসে পূর্ণ। ডমরু ও ত্রিশূল হস্তে ভৈরবনাথেরও একটি ছাঁচ আছে। বাহিরের পাথরের বেদীর উপর একটি সুন্দর কাঠের পক্ষী-মূর্তি রাখা আছে। মন্দিরের দরজার পাশে এক প্রস্তর ফলকে নাগরী অক্ষরে লেখা আছে—"শ্রীহরি। আস্তে পূর্ববঙ্গ রাজ্যাং ত্রিপুর ইতি দেশঃ শৈলমালাবকাশঃ। আসীৎ তস্মিন যশস্বী মনুজন পরভারতঃ ঠাকুরাখ্যঃ সাবিত্রী তস্য পত্নী স্বরচিত ভবনে স্থাপয়াম সতুগীং তত্বস্বীন্দুং প্রমাহী ত্রিপুরপতি শকে শ্রাবণে পূর্ণমাস্যাং শকাব্দ ১৮৩৬।" ইহা হইতে বোধ হয় যে মন্দিরটি এক বঙ্গমহিলার স্থাপিত।

শাকম্বরী হইতে মাইল দেড় সমান পথে চলিয়া ত্রিযুগী গ্রামে পৌছিলাম। ত্রিযুগী বৃক্ষহীন, কিন্তু পথে জংলা আখরোট ও পুষ্পিত রডোডেণ্ড্রন প্রভৃতি বৃক্ষ আছে। আমরা কালিকমলি-বাবার ধর্মশালায় ডাণ্ডি রাখিয়া পাণ্ডা কাশীরামের সহিত ত্রিযুগী নারায়ণ মন্দিরে গেলাম।

মন্দিরটি পূর্বমুখী, এবং একটি চত্বরের মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে ব্রহ্মকুণ্ড ও পশ্চিমে রুদ্র, বিষ্ণু ও সরস্বতী নামে তিনটি ছোট ছোট কুণ্ড আছে। আমরা ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও অপর তিন কুণ্ডের জল স্পর্শ করিয়া মন্দিরে গেলাম। মন্দিরটি উচ্চ ও সুদৃশ্য। বাহিরে

দরজার পাশে একখানি সুন্দর শেষশায়ী বিষ্ণুমূর্তিযুক্ত প্রস্তর ফলক আছে। চত্বর প্রাঙ্গনে নানা নামে নানা মূর্তি বিরাজিত। স্থানটি প্রাচীন। কেদারখণ্ডে বলা হইয়াছে যে ইহার নাম নারায়ণ-ক্ষেত্র, এবং এখানে শঙ্কর ও হৈমবতীর বিবাহ হইয়াছিল, এবং সেই বিবাহের হোমাগ্নি তিন যুগ ধরিয়া প্রজ্জলিত রাখা আছে। তাই ইহার নাম ত্রিযুগী। অল্মোড়া সহরের উত্তরে বাগেশ্বরের ত্রিযুগী নারায়ণ মন্দিরেরও এই দাবি, কিন্তু তাহার পক্ষে কোন নজির নাই।

মন্দিরের অভ্যন্তর নিত্য-হোমের ধূমে ধূসরিত। একটি অন্ধকার-প্রায় কুঠরিতে বিগ্রহ স্থাপিত, স্পষ্ট করিয়া দেখা যায় না। পদ্মনাথ বাবু লিখিয়াছেন "নারায়ণ মূর্তি ধাতু নির্মিত। দক্ষিণে লক্ষ্মীমূর্তি।" ইহার সামনে জগমোহনে হোমাগ্নি জ্বলিতেছে। যাত্রীরা তাহাতে জ্বালাইবার জন্য কাঠের কিছু মূল্য দিয়া ভস্মরেখা গ্রহণ করিতেছে। এই দেবস্থান উখিমঠের কর্তৃত্বাধীন। পূজারী স্থানীয় রবিগ্রাম-বাসী ব্রাহ্মণ। পাণ্ডারা অন্য শ্রেণীয়, সামান্য দক্ষিণাতেই খুসী হয়।

ডাণ্ডি বাহকেরা এখানে পাক করিয়া খাইয়া লইল। তাহাতে জন পিছু পাঁচ আনা পড়িল, তাহা আমরা দিলাম ও নিজেরা জলযোগ করিয়া লইলাম। গঙ্গোত্তরী হইতে যাত্রীরা এখানে আসিয়া কেদারের পথ ধরে। সে পথ দেখিবার জন্য গ্রামের পশ্চিমে পাহাড়ের উপর কিছুদূর গেলাম। বিশেষ লোক চলাচলের চিহ্ন দেখিলাম না। শুনিলাম বিলং নদী পর্যন্ত ষোল মাইল পথ খুব কঠিন।

বেলা দশটায় ত্রিযুগী হইতে পূর্বের পথে মাইল দুই নামিয়া সোমপ্রয়াগের শাখা পথ ধরিয়া রুদ্রপ্রয়াগ হইতে ৩৮ মাইল ৪ ফার্লং ষ্টোনের নিকট সঙ্গমে' পৌছিলাম। এখানে বৃক্ষবহুল পর্বত কন্দরের

একদিক দিয়া সোমগঙ্গার স্বচ্ছ জলধারা তীব্রবেগে বহিতেছে, আর অন্যদিক হইতে আসিয়া মন্দাকিনীর শুভ্র জলরাশি উচ্চভূমি হইতে তাহার উপর ঢালিয়া পড়িতেছে। আমরা ১৯১৩ সালে নির্মিত লোহার পুলে সোমগঙ্গা পার হইয়া মন্দাকিনীর পশ্চিমতীরের চড়াই উঠিতে লাগিলাম। আধ মাইল উঠিলে একটি বাঁধান ঝরণার পাশে ক্ষুদ্র মন্দিরে গণেশের এক মুণ্ডকাটা প্রস্তরমূর্তি আছে। পূজারী, ফাটা অঞ্চলের কান্যকুব্জ বা গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ, যাত্রার সময় মাত্র এখানে বসে। পদ্মনাথ বাবু লিখিয়াছেন, "এই স্থানে পার্বতী স্নান করিতেছিলেন, গণেশ দ্বাররক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময় মহাদেব তথায় আসিলে গণেশ বাধা দিলেন। তাই শিব কর্তৃক ক্রোধভরে তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ হয়। তারপর পার্বতীর অনেক অনুনয়ে ঐরাবতের মুণ্ড আনিয়া গণেশের স্কন্ধে স্থাপন করা হইয়াছিল। ইহাই মুণ্ড-কাটার কাহিনী।" কেদারখণ্ডে বিনায়ক-দ্বারের উল্লেখ আছে কিন্তু এ সব কাহিনী কিছু নাই। এখান হইতে আধ মাইল আরও উঠিয়া মন্দাকিনীর উচ্চ তীর ধরিয়া মাইল দেড় গিয়া একটি ঝরণা ও ডাকবাঙ্গলা পার হইয়া গৌরীকুণ্ড চটি পাইলাম। সেখান হইতে কেদার সাত মাইল।

গৌরীকুণ্ড মন্দাকিনীর তীরে পাহাড়ের গায়ে সঙ্কীর্ণ স্থানে স্থায়ী বসতি। চটিতে শিলাজিত, মৃগচর্ম প্রভৃতি হিমালয়জাত দ্রব্যের ও খাদ্য দ্রব্যের দোকান আছে এবং তামার পাত পিটিয়া কেদার প্রভৃতির পট প্রস্তুত হয়। এখানে কালিকমলি-বাবার ধর্মশালা আছে, কিন্তু আমরা এক দোকান ঘরে উঠিলাম।

গৌরীর মন্দির গুপ্তকাশী ও ত্রিযুগীর মন্দিরের ধরণের, কিন্তু তদপেক্ষা ছোট। প্রধান বিগ্রহ গৌরীশঙ্কর মূর্তি তাহার বামে

লক্ষ্মীনারায়ণ ও ডাইনে জ্বালাজির স্ত্রীমূর্তি। সব মূর্তিই তখন বস্ত্রালঙ্কারে ঢাকা ছিল। সামনে নবদুর্গার কতকগুলি পিত্তলের মুখস। মন্দিরের সামনে গৈরিক-মিশ্রিত রক্তাভ শীতল জলের কুণ্ড। কেদারখণ্ডে এ স্থানের নাম গৌরীতীর্থ ও এখানকার হলদে মাটি ও উষ্ণ প্রস্রবণের উল্লেখ আছে। আমরা শীতলকুণ্ড স্পর্শ করিয়া অদূরে তপ্তকুণ্ডে গেলাম। এখানে একটি পিতলের বৃষমুখ হইতে ফুটন্ত-প্রায় উষ্ণ জলধারা প্রশস্ত কুণ্ডে পড়িতেছে—এত উষ্ণ যে কুণ্ডেও নামিয়া অবগাহন করিতে আমাদের সাহস হইল না। ঘটির সাহায্যে স্নান সমাধা করিলাম। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে এই তপ্ত ধারার ফুট বিশেক দূরেই মন্দাকিনীর তুষার-শীতল স্রোত বহিতেছে। বদরীধামেও এইরূপ দেখি। বিকালে গৌরীকুণ্ড ছাড়িয়া মাইল দেড় চড়াই উঠিয়া একটি ঝরণার নিকট চিরবাসা ভৈরবের ক্ষুদ্র মন্দির পাইলাম। যাত্রীরা এখানে চির বা কাপড়ের টুকরা বাঁধে। তাই ইহার এই নাম। কেদারখণ্ডে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার আধ মাইল পর এক জঙ্গল চটি পড়িল। তাহার উপরে বোধহয় শীতকালে কেহ থাকে না। এখান হইতে পর্বত-গাত্র বৃক্ষহীন ও পথের ধারে খর্ব ঘাসের মধ্যে হলদে ও বেগুনে রঙ্গের ছোট ছোট ফুল দেখা দিল। চড়াই ক্রমশঃ কঠিন হইতে লাগিল এবং দুই ধারে পর্বতগাত্রে প্রথমতঃ জলধারা ও ক্রমশঃ শুভ্র তুষার-ধারা মন্দাকিনীতে নামিতেছে দেখা গেল। এইরূপে মাইল দেড়েক চলিয়া একটা বড় তুষার-ধারা পার হইয়া পাঁচটায় আমরা রামবাড়া চটিতে পৌঁছিলাম। চটির চারিদিকে বরফ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, খুব শীত বোধ হইল। দোকান হইতে আটা ইত্যাদি কিনিয়া কালিকমলি-বাবার ধর্মশালায় আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। ধর্মশালায় রাত্রির জন্য কম্বল ও পট্টু ধার পাওয়া গেল।

রামবাড়া—কেদারনাথ। ৩ মাইল।

(১৪ই মে)

ভোর সাড়ে পাঁচটায় রামবাড়া হইতে বাহির হইলাম। পূর্ব দিনের শেষ দিকের মতই পথ ও শীত। মাইল খানেক উঠিতেই সামনে কেদারের উপরের তুষারশৃঙ্গ-রাজিতে সূর্যোদয় দেখা গেল—মনে হইল যেন মুহূর্তে শতেক প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। আর আধ মাইল চলিলে চড়াই শেষ হইল। তাহার নির্দেশক গরুড় এক ক্ষুদ্র মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন এবং একজন ঢুলী ডঙ্কা বাজাইতেছে। গরুড়ের পূজারী উখিমঠবাসী গৌড় ব্রাহ্মণ। ঢুলীটির বাসস্থান শোনিতপুর।

এখান হইতে কেদারপুরী পর্যন্ত দেড় মাইল পথ সহজ, মাঝে মাঝে শুধু বরফ ভাঙ্গিতে হয়। অল্পদূর অগ্রসর হইতে তুষার-মণ্ডিত গিরি-প্রাচীরের ক্রোড়ে কেদারনাথের মন্দির দেখা গেল—গত পনর দিনের আকাঙ্ক্ষা যেন তখনই মিটিল। আমরা ডাণ্ডি হইতে নামিয়া পদব্রজে চলিলাম ও মন্দাকিনী পার হইয়া তাহার সদ্যঃতুষারজাত জলে স্নান করিয়া, ঘাটের উপর ছোট মন্দিরে গঙ্গা দেবীকে প্রণাম করিয়া কেদারপুরীতে উঠিলাম। এখানে কালিকমলি-বাবার ধর্মশালা আছে, কিন্তু পাণ্ডার ব্যবস্থামত আমরা নেপাল সরকার নির্মিত এক ধর্মশালায় উঠিলাম ও তথায় ডাণ্ডি ও মালপত্র রাখিয়া দেব-দর্শনে বাহির হইলাম।

কেদারপুরীর উত্তরে একটা ময়দানের পারে উচ্চ মঞ্চের উপর কেদারনাথের মন্দির নির্মিত। গঠন ও অবস্থান দুইই মহান্। মন্দিরের সামনে পূজার পুষ্পাদি বিক্রয় হইতেছে। অবারিত দ্বার, শুধু

দ্বারপালদের জন্ম তিন পয়সা দক্ষিণা দিতে হয়। মন্দিরে ঢুকিয়া কেদারের সামনে রক্ষিত পাত্রে কিছু ভেট দিয়া পাণ্ডাজির নির্দেশ মত কেদারের পূজা করিয়া ও গাত্রে ঘৃত লেপন করিয়া প্রদক্ষিণ করিলাম—অত্যন্ত শীতে লেপা ঘৃত কেদারের গায়ে সাদা সাদা লাগিয়া থাকে। কেদার সাধারণ লিঙ্গের ন্যায় নহে, উপবিষ্ট মহিষের পিঠের আকারের স্বাভাবিক প্রস্তর শৃঙ্গ। পদ্মনাথ বাবুর কথায় "প্রায় আড়াই হাত উচ্চ সূক্ষ্মাগ্র এক প্রকাণ্ড প্রস্তর; উত্তর দক্ষিণে লম্বা প্রায় চারি হাত, পূর্ব পশ্চিমে মধ্যভাগের বেধ প্রায় দুই হাত হইবে। ভিতরে ভিড় হইলেও যাত্রীরা সকলেই কেদারের অর্চনা স্বহস্তে সম্পাদন করিতে পারে।" কোন কোন যাত্রী তামার বলয় কেদারের গায়ে স্পর্শ করিয়া অনন্তর মত ধারণ করেন।

মন্দিরের জগমোহনে কয়েকটি প্রাচীন প্রস্তর-মূর্তি এবং মধ্যস্থলে একটি পিতলের বৃষ-মূর্তি আছে। বাহিরে একটি প্রকাণ্ড মার্বেল প্রস্তর-নির্মিত উপবিষ্ট বৃষের সুন্দর মূর্তি। কেদারের পূজা সারিয়া আমরা মন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম। দরজার ডাহিনে গণেশ স্থাপিত ও মন্দিরের চারিদিকে মাতৃকা প্রভৃতি প্রাচীন মূর্তি-সকল নানা নামে বিরাজ করিতেছে। প্রাঙ্গণের উত্তর পূর্ব কোণে একটি ছোট মন্দিরে স্বাভাবিক প্রস্তর শৃঙ্গ ঈষাণেশ্বর নামে পূজিত হইতেছে। এই সব অসংখ্য দেবস্থানে যাত্রীরা এক একটি পাই ভেট দেয়।

কেদারের পূজারী উখিমঠের রাওল সাহেবের নিযুক্ত দক্ষিণ-দেশী জঙ্গম শ্রেণীর শৈব। কেদারের অন্ন ভোগ হয়। মন্দির সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত খোলা থাকে, আবার সন্ধ্যায় আরতির সময় খোলে। বিকাল চারিটা ভোগের সময়, তখন মন্দির যাত্রীদের পক্ষে বন্ধ।

মন্দির হইতে নামিয়া আমরা উদক-কুণ্ড নামে এক ক্ষুদ্র

আচ্ছাদিত কুণ্ডে নানা ভঙ্গিতে আচমন করিয়া এবং উত্তরের এক ছিদ্র দিয়া কেদারের মন্দির দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

কেদার প্রাপ্তির বকশিশ স্বরূপ প্রত্যেক কুলীকে আট আনা করিয়া খিচুড়ির দাম দেওয়া হইল। আমরা নিজে দোকান হইতে পুরি মেঠাই কিনিয়া খাইলাম। পাণ্ডাজি ও তাহার একটি আত্মীয়কে ঐরূপ ভোজন করাইলাম। দুপুরে বাহির হইয়া চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া চারিটার সময় ভোগ দেখিতে মন্দিরে গেলাম। তখনই চারিদিকে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকার হইয়া আসিল। কেদারের ভোগ এই অঞ্চলের লাল চাউলের গোলা। দরজার পার্শ্বস্থিত গণেশকেও ঐ ভোগ দেওয়া হয়। বাসায় ফিরিবার কিছুক্ষণ পর ঘণ্টা হইলে আবার মন্দিরে গিয়া কেদারের আরতি দেখিয়া আসিলাম। কেদার ১১৫৮০ ফুট উচ্চ।

কেদার রমণীয় স্থান। দুই চারি দিন থাকিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমাদের সামনে যাত্রার দীর্ঘ ও কঠিন অংশ পড়িয়া থাকায় পর-দিনই কেদার ত্যাগ করা মনস্থ করিয়া সেই রাত্রে পাণ্ডা লক্ষ্মীনারায়ণের নিকট বিদায় লইলাম। কলিকাতা হইতে সে আমাদের সঙ্গে আসিয়াছে ও তত্ত্বাবধান করিয়াছে, আর তখন পর্যন্ত অন্য যাত্রীও পায় নাই। এই সব বিবেচনা করিয়া তাহাকে কিছু বেশী দক্ষিণা দিতে হইল। সে সন্তুষ্ট হইয়া এখানকার প্রথানুযায়ী পূর্ব বৎসরে পাহাড় হইতে আহৃত একটি শুষ্ক কমল দিয়া আশীর্বাদ করিয়া সুফল জানাইল। আমরাও হৃষ্টচিত্তে আহার করিয়া নিদ্রা গেলাম। কেদারে শীতের খুব প্রকোপ। চলিত প্রথানুসারে পাণ্ডাজি আমাদের বিছানার জন্য কম্বল ইত্যাদি ও ঘরে আগুন রাখার জন্য আঙ্গেঠি ও কাঠ দিয়াছিলেন। তাহা এবং আমাদের সঙ্গের কাপড়ের সাহায্যে রাত্রে বিশেষ কষ্ট হইল না।

কেদার লইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্বাদশটি জ্যোতির্লিঙ্গ আছে।

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুণম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালং, ওঁকারে মমলেশ্বরম্।
পরল্যাং বৈদ্যনাথঞ্চ, ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্।
সেতুবন্ধে তু রামেশং, নাগেশং দারুকাবনে।
বারাণস্যাং তু বিশ্বেশং, ত্র্যম্বকং গোমতীতটে।
হিমালয়ে তু কেদারং, ঘৃষ্মেশ্বরং ইলাপুরে।

এই জ্যোতির্লিঙ্গগুলি সবই বোধ হয় আদিতে স্বাভাবিক প্রস্তর-শৃঙ্গ রূপে পূজিত হয়। অন্ততঃ, কেদার নামের সহিত এই রূপের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখা যায়—কেদারনাথ স্বয়ং, ভীল-কেদার, অল্মোড়ার নিকট বৈদ্যনাথে কেদার, এবং শুনিয়াছি কাশীর কেদার—সবই স্বাভাবিক প্রস্তর শৃঙ্গ। ঈশ্বরেচ্ছায় ক্রমে ক্রমে আমার আটটি জ্যোতির্লিঙ্গের দর্শন লাভ হইয়াছে। বাকি—গোলকুণ্ডার দক্ষিণে কৃষ্ণা-নদী-তীরে শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুন, নাসিকের উপরে গোদাবরীর উৎপত্তি-স্থানে ত্র্যম্বক, ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্ আর অল্মোড়ার নিকট দারুকাবনে নাগেশ বা জাগেশ্বর—এ চারিটি এ জন্মে দেখিবার আশা করি না।

কেদারের মহিষের পিঠের মত আকৃতির এক কাহিনী প্রচলিত আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর গোত্র-হত্যা, আচার্য-হত্যা পাপক্ষালনের জন্য মহাদেবের আরাধনা করিতে পাণ্ডবেরা নাকি হিমালয়ে আসেন। তাঁহারা প্রথমে গুপ্ত-কাশীতে আসিয়া সেখানে মহাদেবকে না পাইয়া আরও উত্তরে চলিয়া দেখেন যে দুর্গম জনপ্রাণীহীন স্থানে একটি মহিষ চরিতেছে। তাহাকে গুপ্তরূপ মহাদেব জানিয়া ও পলায়মান দেখিয়া ভীম গিয়া তাহার লেজ ধরেন। মহিষরূপী মহাদেব পলাইতে না পারিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করেন। তাঁহার পশ্চাৎভাগ কেদাররূপে উপরেই রহিয়া যায়; আর বাহু তুঙ্গনাথ, মুখ রুদ্রনাথ, নাভি মধ্যমেশ্বর এবং

জটা কল্পেশ্বর রূপে প্রকট হয়। ইঁহারাই পঞ্চকেদার। কেদারখণ্ডে এ কাহিনী নাই, তবে পঞ্চকেদারের নাম আছে—কেদারং মধ্যমং তুঙ্গং রুদ্রনাথং কল্পেশ্বরম্।*

কেদারমন্দিরের ব্যবস্থা বৃটিশ গভর্ণমেন্টের কতৃত্বাধীন উখিমঠের রাওল সাহেবের হাতে। ইহার জন্য পূর্ব রাজাদের দত্ত গুঁট আছে। কেদারের মন্দির প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে খোলা হইয়া ছয় মাস খোলা থাকে। ইহাই যাত্রার সময়। আবার কার্তিক মাসে মন্দির বন্ধ করিয়া, পূজারীরা নামিয়া যায় আর ছয় মাস মন্দির দ্বাররুদ্ধ অবস্থায় থাকে, বরফ পড়িয়া ঢাকিয়া যায়। শুনা যায় যে শীতের পূর্বে মন্দির বন্ধ করিবার সময় পূজারীরা যথেষ্ট ঘৃত ঢালিয়া একটি প্রদীপ মন্দির মধ্যে জ্বলিয়া যায়। উহা নাকি ছয়মাস ধরিয়া জ্বলিতে থাকে ও বৈশাখে মন্দির খোলার সময়ও জ্বলিতে দেখা যায়। ঐ সময় উপস্থিত হইয়া এই 'অখণ্ড জ্যোতি' দেখা যাত্রীদের বিশেষ কাম্য। আমরা এই 'পট খোলা'র বিশ দিন পর কেদারে পৌঁছি। তখনও স্থানে স্থানে রাস্তার ধারে ও ঘরের চালে মোটা বরফ পড়িয়া আছে দেখা গেল।

অল্পদিন আগে খোলা হইলেও তখন কেদারে ডাকঘর, ঔষধালয় ও নানা দ্রব্যের দোকান আসিয়াছে। কেদারপুরী প্রায় ১২০০০ ফুট উচ্চ তাই এখানে ভাত, ডাইল প্রভৃতি ভাল সিদ্ধ হয় না, পুরি মেঠাই-এর বেশী চলন। জ্বালানি কাঠ সব নীচে হইতে আসে।

---

* ইহার মধ্যে কেদার ও তুঙ্গ আমরা দেখি। মধ্যমেশ্বর উখিমঠের মাইল আঠার উত্তরে, কালীমঠ হইয়া যাওয়া যায়। এই মন্দির শীতের ছয়মাস বন্ধ থাকে তখন পূজা উখিমঠে হয়। রুদ্রনাথের স্থান মণ্ডল চটির মাইল বার উত্তরে। ইহা গোপেশ্বরের জঙ্গম রাওল সাহেবের অধীন, কিন্তু পূজারী ব্রাহ্মণ। এই মন্দিরও শীতের ছয় মাস বন্ধ থাকে, তখন পূজা গোপেশ্বরে হয়। কল্পেশ্বর কুমার চটির উত্তরে উরগম্ নামে বিশিষ্ট গ্রামে অবস্থিত। ইহার অধিকারী ঐ গ্রামের এক গৃহস্থ জঙ্গম।

তিন দিকে পর্বতে বেষ্টিত, তুষারে পরিব্যাপ্ত, রৌদ্রস্নাত বিস্তীর্ণ রমণীয় ভূমিতে কেদারপুরী অবস্থিত এবং "নিকটস্থ মন্দাকিনী ও তৎ-সহচরী দুগ্ধগঙ্গার জলপ্রপাতের গভীর গর্জনে সতত মুখরিত।"

পদ্মনাথ বাবু লিখিয়াছেন "কেদারনাথ পুরীর পশ্চিমে মন্দাকিনী; উত্তরে ও পূর্বে উচ্চ বরফময় পর্বতশৃঙ্গ; দক্ষিণে খানিকটা ময়দান। উত্তরের পর্বতের দিকে স্বর্গারোহণ মহাপথ নির্দেশিত হইয়া থাকে। সেখানে যাওয়া আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য, বরফ ভাঙ্গিয়া উঠিতে হয়। পূর্ব পর্বতের দিকে ভৈরবঝম্প, উহা হইতে ঝাঁপ দিয়া নাকি পূর্বে অনেকে দেহত্যাগ করিত। এখন অবশ্য উহা নিষিদ্ধ। মন্দাকিনীর উৎপত্তি-স্থল উত্তরস্থিত পর্বতশৃঙ্গের উত্তরে ভীমতাল নামক স্থানে।

"কেদারের আশে পাশে নীল, রক্ত, পীত নানা বর্ণের পুষ্প ভুই-চাঁপার ন্যায় প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। এই ঋতুতে বৃষ্টির জলে এইগুলির উদ্ভব হয়। কেদারের উপরে পর্বতের মধ্যে এক জাতীয় কমল ফুল শ্রাবণ মাসে ফুটিয়া থাকে। ধনী যাত্রীরা ঐ ফুল সংগ্রহ করিয়া মহাদেবের উপর চড়াইবার জন্য পাণ্ডাদের হাতে বহু টাকা দিয়া আইসেন।

"পাণ্ডাপুত্র সুফল দিবার সময়ে আমাদিগকে গত বর্ষের আহৃত এক একটি কমল ফুল দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। পাপড়ি শুষ্ক ও বর্ণ-হীন হইলেও পদ্মেরই ন্যায় বোধ হইল। গর্ভকেশরের চতুঃপার্শ্বে আরও দশটি ছোট ছোট গর্ভকেশর রহিয়াছে; নাল অকর্কশ কিন্তু শুষ্কাবস্থায় কঠিন। যাহা হউক, 'ন পর্বতাগ্রে নলিনী প্ররোহতি' এই কবি-বাক্য এখানে ব্যর্থ হইয়াছে।"

এ ব্যতিক্রম মহাকবি কালিদাসের অবিদিত ছিল না। তিনি মেঘদূত ও রঘুবংশ কাব্যে হিমালয়শীর্ষস্থিত মানসহ্রদে স্বর্ণকমল ফুটাইয়াছেন। দেখা যাইতেছে যে ইহা একেবারে কাল্পনিক নহে।

কেদারনাথ—রামপুর—ফাটা। ১৭ মাইল
(১৫ই মে)

পরদিন প্রাতে কেদারের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া আমরা ফেরৎ চলিলাম। বাড়ী যাইবে বলিয়া পাণ্ডাজিও সাথে চলিলেন। এখন পথের বেশী ভাগ উৎরাই, দিনও পরিষ্কার। আমরা দ্রুত নামিতে লাগিলাম। রামবাড়া চটিতে চা খাইয়া, গৌরীকুণ্ড ও সোমপ্রয়াগ পার হইয়া মন্দাকিনীর তীর ধরিয়া সোজা চলিয়া রামপুর চটিতে পৌছিলাম ও কালিকমলি-বাবার ধর্মশালায় দুপুরে স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম করিলাম। আবার বিকালে বাহির হইয়া পাঁচ মাইল চলিয়া ফাটা চটিতে রাত্রের মোকাম করিলাম। পাণ্ডাজি থামিলেন না, আরও দশ মাইল গিয়া সেই রাত্রেই শোনিতপুরে বাড়ীতে পৌছিবে বলিয়া অগ্রসর হইলেন। ইঁহাদের পাহাড়ে চলার শক্তি অসাধারণ। ফাটা চটিতে কানপুরের রামকৃষ্ণ-মিশনের তিনজন বাঙ্গালী সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা কেদার হইতে ফিরিতে ছিলেন।

ফাটা—কালীমঠ—নলা চটি—উখিমঠ—গোলিয়াবগড়। ১৮ মাইল (১৬ই মে)

আজ কালীমঠ ঘুরিয়া যাইব বলিয়া খুব ভোরে বাহির হইলাম। মৈখণ্ডা ও ব্যুঙ্গ চটি পার হইয়া ব্যুঙ্গ নদী হইতে আধ মাইল আন্দাজ চড়াই উঠিয়া ২৭ মাইল ৩ ফালং ষ্টোনের নিকট বেলা সাতটায় কালী-মঠের শাখা পথ পাইলাম। ডাণ্ডিবাহকদিগকে ডাণ্ডি ও মাল লইয়া নলা চটিতে গিয়া আহার করিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতে ছাড়িয়া দিয়া গিরিধারী কুলীকে সঙ্গে লইয়া আমরা শাখা পথ দিয়া মন্দাকিনীর দিকে নামিতে লাগিলাম।

একেবারে জলহীন এবং ক্রমশঃ খুব খাড়া ও প্রায় নিশ্চিহ্ন পথে মাইল খানেক নামিয়া মন্দাকিনীর পুল পার হইলাম। সেখানে জল পান করিয়া নদীর পূর্বতীর ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। এইখানে এক ছত্রি কৃষক আমাদের সঙ্গে মিলিল। তাহার সহিত আলাপে এ অঞ্চলের কিছু কিছু খবর জানা গেল। মন্দাকিনী হইতে মাইল খানেক উঠিলে অন্য এক নদীর তীরে কালীমঠের মন্দিরগুলি দেখা গেল। মাইল টেক চলিয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা সাড়ে আটটা।

কালীমঠে ছোট বড় কয়েকটি সুন্দর প্রাচীন মন্দির আছে ও তৎ-সংলগ্ন নদীতে নামার বাঁধা ঘাট আছে। কেদারখণ্ডে এ স্থানকে কালীক্ষেত্র এবং এই নদীকে সরস্বতী বলা হইয়াছে। প্রাঙ্গণের মধ্যে একটি সামান্য ছোট টিনের ছতরির তলে মহাকালীর পীঠ স্থাপিত। উহা তামার পাতে মোড়া চতুষ্কোন প্রস্তরখণ্ডে ঢাকা। দেবী পক্ষের অষ্টমীর রাত্রে নাকি এই ঢাকনা সরাইয়া পূজা হয়। এইস্থানের একটু উপরে স্থিত ভৈরবের ঘরে পশুবলি হয়। তাহার চিহ্ন স্বরূপ ঘরের গায়ে হত পশুর শৃঙ্গ ঝুলিতেছে। আমরা পথে ও দুই একস্থানে এইরূপ দেখি। এখানে তাহার অর্থ বুঝিলাম।

মহাকালীর পীঠের পশ্চিমে এখানকার সর্বোচ্চ মন্দির। উহা মহালক্ষ্মীর। ইহার পশ্চিম দরজার পাশে দেড় ফুট লম্বা ও নয় ইঞ্চ চওড়া এক প্রাচীন শিলালেখ গাঁথা আছে। এখানেও জগমোহনে হোমাগ্নি জ্বলিতেছে, তাহার ধূমে মন্দিরের অভ্যন্তর ধূসরিত। মহালক্ষ্মী ও অন্যান্য দেবতার মূর্তি ভাল করিয়া দেখা গেল না। পূজারী নিকটের কবিলটা গ্রামের মহেশানন্দ নামে ব্রাহ্মণ। ইহাদের পূর্ব পুরুষ নাকি মহারাষ্ট্র দেশ হইতে আসেন। এই দেবস্থান উখিমঠের রাওল সাহেবের কর্তৃত্বাধীন।

মহালক্ষ্মীর মন্দিরের পশ্চিমে দুইটি ছোট সুন্দর মন্দির আছে। একটিতে আছে হর-পার্বতীর সুন্দর যুগল মূর্তি, অপরটিতে অমনি সুন্দর মহাসরস্বতী মূর্তি, আটহাতে আট আয়ুধ ধরিয়া আছেন। আমরা আয়ুধগুলির কথা বলিতে, তথায় উপস্থিত পূজারীর আত্মীয় একটি যুবক চণ্ডী খুলিয়া দেবীর মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী এই তিন মূর্তির ধ্যানাবলী হইতে তৃতীয় ধ্যান পড়িল—ঘণ্টা-শূল-হলানি শংখমুসলে চক্রং ধনুঃ সায়কং হস্তাব্জৈর্দধতীং ঘনাংত বিলসচ্ছীতাংশুতুল্যপ্রভাম্। গৌরীদেহ-সমুদ্ভবাং ত্রিনয়নামাধারভূতাং মহাপূর্বামত্র সরস্বতীমনুভজে শুংভাদি দৈত্যার্দিনীম্।" দেখিলাম মূর্তির আয়ুধগুলি ধ্যানের অনুরূপ। ইহা হইতে হয়ত চণ্ডীর কল্পনা ও এই মূর্তির রচনার কাল নির্ণয়ে সাহায্য হইতে পারে, তাই এই কথা পাড়িলাম। দেখিয়াছি যে জ্বালামুখী—এমন কি কাশ্মীরের ক্ষীর-ভবানী—হইতে আসামের কামাখ্যা পীঠ পর্যন্ত সব দেবীস্থানে চণ্ডী-পাঠের প্রথা চলিত আছে। কালীমঠের মন্দির ও মূর্তিগুলির অঙ্গসৌষ্ঠব হইতে বুঝা যায় যে এক সময় এ অঞ্চলে কিরূপ মার্জিত ও সমৃদ্ধ লোকের বসতি ছিল।

কালীমঠের তিন মাইল দূরে পঞ্চকেদারের অন্তর্গত মধ্যমেশ্বর এবং নদীর অপর পারে পাহাড়ের উচ্চ শিখরে কালীশিলা আছে যেখানে নাকি চণ্ডমুণ্ড বধ হইয়াছিল।

কালীমঠে একটি ধর্মশালা ও খান-দুই দোকান আছে। নদীতে স্নান করিয়া মন্দির দর্শন করিয়া ও জলযোগ করিয়া দশটার সময় আমরা কালীমঠ ত্যাগ করিলাম। পূর্বের পথে ফিরিয়া মন্দাকিনীর পুল পার হইয়া অন্য এক পথ ধরিয়া আড়াই মাইল আন্দাজ চলিয়া নলা চটির পথ পাইলাম ও আধ মাইল টেক চলিয়া সাড়ে বারটায় ঐ চটিতে পৌছিলাম। এই পথে মাঝে মাঝে ঝরণা আছে এবং চড়াই কম।

নল। চটিতে মাছির উপদ্রব। আমরা কালীমঠে যাতায়াতে বড় ক্লান্ত হইয়া ছিলাম। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ও প্রধান মন্দিরটি দেখিয়া ও এখানে প্রস্তুত কেদার বদরীর তামার পট কিছু কিনিয়া ও চটির চৌধুরীর নিকট হইতে আমাদের জিনিস লইয়া চমোলির পথ ধরিলাম। এখান হইতে চমোলি ৩০ মাইল।

মাইল দেড় খাড়া নামিয়া মন্দাকিনীর পুল পাইলাম। এখানে গুপ্তকাশী হইতে এক শাখা পথ আসিয়া মিলিয়াছে। নদী পার হইয়া এক মাইল চড়াই উঠিয়া উখিমঠ সহর পাইলাম। প্রথম রাওলদের সমাধিক্ষেত্র। সিষ্টর নিবেদিতা লিখিয়াছেন যে এখানে একটী পুরাতন কুণ্ড ও সুন্দর প্রাচীন মূর্তির ভগ্নাবশেষ আছে, আর উত্তরের পর্বতের চমৎকার দৃশ্য পাওয়া যায়। একটু উপরে রাওল সাহেবের প্রকাণ্ড অট্টালিকার সামনে ডাণ্ডি রাখিয়া কয়েক ধাপ উঠিয়া মঠের মধ্যে গেলাম।

উখিমঠ কেদারের রাওল সাহেবের বাসস্থান এবং গদি অর্থাৎ তাঁহার অধীনস্থ দেবস্থান সমূহের কেন্দ্রীয় অফিস। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে রাওল সাহেব এগুলির তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সব দেবস্থানের জন্যই পূর্ব রাজাদের দত্ত গুঁট বা দেবত্র আছে। উখিমঠের প্রাঙ্গণ মধ্যে ওঁকারনাথের বিশাল মন্দির, তাহাতে মান্ধাতার মূর্তি এবং কেদারনাথ ও মধ্যমেশ্বরের মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত। শীতকালে কেদার ও মধ্যমের নিজ নিজ মন্দির বন্ধ থাকে, তখন তাঁহাদের এই মূর্তির পূজা চলে। এক ঘরে পাণ্ডবদের মূর্তি ও এক ঘরে উষা, অনুরুদ্ধ প্রভৃতির মূর্তি স্থাপিত আছে। এগুলি অতি সামান্য রকমের ও আধুনিক বলিয়া বোধ হইল। কেদারখণ্ডে ইহাদের কোন উল্লেখ নাই, শুধু যুবনাশ্বের পুত্র রাজা মান্ধাতা এস্থানে তপস্যা করিয়া ছিলেন এই কথা আছে। মঠে একটি সংস্কৃত পাঠশালা আছে।

আমরা প্রথমে ওঁকারনাথ মন্দিরে গেলাম। মন্দিরটি উচ্চ ও সুগঠিত কিন্তু আধুনিক বোধ হইল। সিষ্টর নিবেদিতা লিখিয়াছেন যে ইহার উপরের অংশ আধুনিক কিন্তু বনিয়াদ প্রাচীন। ওঁকারনাথ পঞ্চমুখ শিবলিঙ্গ, তাঁহার পশ্চাতে মান্ধাতার মূর্তি স্থাপিত। জগমোহনে সুন্দর ও সুসজ্জিত রৌপ্য-নির্মিত কেদারনাথ, মধ্যমেশ্বর ও বদরীনারায়ণ মূর্তি ও একটি পিতলের বৃষ-মূর্তি আছে। মন্দিরের পশ্চিমে অন্য চত্বরে রাওল সাহেবের গদি, এখানে কয়েকজন কর্মচারী কেদার ও মধ্যমেশ্বরের শীতকালের পূজার সাহায্যের জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। ইহার সংলগ্ন এক কুঠরিতে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর মূর্তি রহিয়াছে। ওঁকারনাথ মন্দিরের অপর দিকে এক ঘরে অনেকগুলি শিবলিঙ্গ রহিয়াছে ও এক কুঠরিতে অনিরুদ্ধ, উষা, কৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন, চিত্রলেখা প্রভৃতি মূর্তি আছে। এখানে কেদার-মন্দিরের ও উখিমঠের হাফটোন ছবি বিক্রয় হয়। এই স্থান হইতে নাকি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র অনিরুদ্ধ বাণাসুরের কন্যা উষাকে হরণ করিয়া দ্বারকায় লইয়া যান এবং সেইজন্য ইহার নাম উখিমঠ হইয়াছে।

উখিমঠ এ অঞ্চলের এক বিশিষ্ট সহর। এখানে স্থায়ী ভাবে থানা, ডাকঘর, হাসপাতাল ও নানা দ্রব্যের দোকান থাকে। কালিকমলি-বাবার এক ধর্মশালাও আছে।

মঠ দর্শন সারিয়া আমরা আগে চলিলাম। মন্দাকিনীর অপর পারে পাহাড়ের উপর গুপ্তকাশী ও শোণিতপুর দেখা যাইতে লাগিল। আড়াই মাইল চড়াই উঠিয়া, গণেশ চটি পার হইয়া আমরা কাথা চটিতে মন্দাকিনীর উপত্যকা হইতে উহার উপনদী আকাশগঙ্গার উপত্যকায় পড়িলাম। এখান হইতে দূরে তুঙ্গনাথ পর্বতের নগ্ন শীর্ষ দেখা গেল। আড়াই মাইল উৎরাই নামিয়া সন্ধ্যাকালে আমরা আকাশগঙ্গার তীরে

গোলিয়াবগড় চটিতে পৌছিয়া রাত্রের মোকাম করিলাম। নলা চটি হইতে গোলিয়াবগড় সাড়ে সাত মাইল। চটিতে কয়েকখানি দোকান আছে ও মধ্যদিয়া পানি-চাক্কির জন্য নালা বহিতেছে।

গোলিয়াবগড়—বানিয়াকুণ্ড—তুঙ্গনাথ। ৯মাইল
(১৭ই মে)

ভোরে চটির নীচে আকাশগঙ্গা পার হইয়া উহার তীরের উচ্চ ভূমিতে পাঁচ ফার্লং খাড়া চড়াই উঠিয়া দোয়েড়া চটি পাইলাম। সেখান হইতে পাঁচ ফার্লং সমান পথে চলিয়া এক ক্ষুদ্র চটি, তাহার পর পাঁচ ফার্লং সমান পথ ও এক মাইল খাড়া চড়াই উঠিয়া জঙ্গলের মধ্যে পোথি-বাসা চটি। ইহার দক্ষিণে নাকি ঝরণার সাহায্যে কাঠের বাসন তৈয়ার হয় না। পোথিবাসা হইতে মাইল দুই সামান্য চড়াই উঠিয়া, দোগলবিটা ড'ক-বাঙ্গলার পথ ছাড়াইয়া বানিয়াকুণ্ডে পৌছিলাম ও কালিকমলি-বাবার ধর্মশালায় উঠিলাম।

বানিয়াকুণ্ড ছোট পার্বত্য চটি। এখানে জলের কিছু অন[illegible]। তুঙ্গনাথের পাণ্ডা ক্ষেমানন্দ উপস্থিত হইলে আহারাদির পর বিক[illegible] আড়াইটার সময় তাহার সহিত বাহির হইয়া সওয়া মাইল আন্দ[illegible] চলিয়া চোপতা চটিতে, গুপ্তকাশী হইতে ১৪ মাইল ষ্টোনের নিক[illegible] তুঙ্গনাথের পথ ধরিলাম। পূর্বে চড়াই খুব কঠিন ছিল। মিষ্টর নিবেদি[illegible] লিখিয়াছেন যে, গোয়ালিয়রের রাজা উহা কতক সহজ করেন। এ[illegible] কলিকাতার চোরবাগানের শেঠ হাজারিমল দুধওয়ালার ব্যয়ে পাহাড়ের এক দিক দিয়া উঠিবার ও অন্য দিক দিয়া নামিবার সওয়া দুই মাইল করিয়া খাড়া কিন্তু সুগম পথ হইয়াছে। তুঙ্গনাথ মন্দাকিনী ও অলকানন্দার উপত্যকা দ্বয়ের শীর্ষ-দেশে প্রায় ১১০০০ ফুট উচ্চে স্থিত এবং বৃক্ষহীন।

তাই এখানে শীতের খুব প্রকোপ ও বিকালের দিকে মেঘের আবির্ভাব হয় এবং কোন কোন দিন বৃষ্টিও হয়। আমরা সাড়ে চারিটার সময় তুঙ্গনাথ শিখরে পৌছিলাম, তখনই চারিদিক মেঘে অন্ধকার। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে এ সময় অলকানন্দার উপত্যকার উচ্চ ভাগে প্রায় প্রত্যহ বিকালে ঝড় বৃষ্টি হয়। এজন্য যাত্রীদের সতর্ক থাকিতে হয়।

তুঙ্গনাথের বসতিটি ছোট এবং শীতের ছয় মাসের বন্ধের পর অল্প দিন হইল খুলিয়াছে বলিয়া জনবিরল। তখনও স্থানে স্থানে বরফ পড়িয়া আছে। এখানে এক জাতীয় ইন্দুর দেখিলাম, তাহাদের লেজ নাই। আমরা কালিকমলিবাবার ধর্মশালায় ডাণ্ডি ও জিনিস পত্র রাখিয়া বাহির হইলাম।

বসতির নীচে অমৃত-কুণ্ড নামে একটি কুণ্ডে গজমুখ ও বৃষমুখ হইতে দুইটি ক্ষীণ জলধারা পড়িতেছে। আমরা উহার জল স্পর্শ করিয়া বসতির মাথায় তুঙ্গনাথ মন্দিরে উঠিলাম। এখান হইতে কেদার বদরী প্রভৃতি তুষার-মণ্ডিত গিরিরাজি দেখা যায় কিন্তু মেঘের জন্য কিছু দেখা গেল না। মন্দিরের বাহিরে প্রাঙ্গণে সাদা রং-এর রগ-বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর-শৃঙ্গকে বীরভদ্র বলা হয়। চত্বরে ছোট ছোট মন্দিরে গণেশ, ভৈরব, পার্বতী প্রভৃতি নানা মূর্তি বিরাজিত।

পঞ্চকেদারের অন্তর্গত তুঙ্গনাথের এই মন্দিরটি প্রাচীন ও বিশাল। কাল ইহাকে দীর্ণ করিয়াছে, কিন্তু এই জনহীন দুর্গম অঞ্চলে তুঙ্গ পর্বত-শীর্ষে ইহাকে বিরাজিত দেখিয়া মাইকেলের উক্তি মনে হইল—

"আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণবলে,
নির্মিলা মন্দির যারা সুন্দর, ভারতে,
তাদের সন্তান কিগো আমরা সকলে?"

আরতির সময় মন্দিরের ভিতরে গেলাম। অস্পষ্ট আলোকে

তুঙ্গনাথ লিঙ্গাকৃতি স্বাভাবিক প্রস্তর শৃঙ্গ বলিয়া বোধ হইল এবং উহারই বাহিরের বৃহৎ অংশ যাত্রীরা আলিঙ্গন করে মনে হইল। তুঙ্গনাথের পশ্চাতে শঙ্করাচার্য ও ব্যাসদেবের মূর্তি রহিয়াছে।

আরতির সময় দার্জিলিং হইতে আগত একটি নেপালী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তিনি পেন্সন-প্রাপ্ত পুলিসের দারোগা ও কিছু স্থুল-দেহ। পায়ে ঘা হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতেছিলেন কিন্তু বদরী-দর্শনের আগে কোন যান ব্যবহার করিতে রাজি হন নাই। আরতির সময় তিনি ভক্তি-গদ্‌গদ স্বরে মহাদেবের স্তুতি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

আরতির পর বাসায় ফিরিয়া পাণ্ডা ক্ষেমানন্দের নিকট বিদায় হইলাম। অল্প দক্ষিণাতেই সে সন্তুষ্ট হইল। দোকান হইতে পুরি কিনিয়া আমরা আহার করিলাম। ডাণ্ডির কুলিদিগকেও ঐরূপ খাওয়ান হইল, জন পিছু পাচ আনা লাগিল। তারপর আমরা শয়ন করিলাম। এখানে খুব শীত। কিন্তু ধর্মশালার উপরতলায় আগুন জ্বালিতে দিল না। যাহা হউক কম্বল ও পট্টু ধার পাওয়া গেল। তাহার সাহায্যে কোন মতে রাত্রি কাটিল। ডাণ্ডি বাহকদের কম্বলের ব্যবস্থা হইল।

পাণ্ডাজির নিকট শুনিলাম যে কেদারনাথের মত, তুঙ্গনাথেও উত্তরে স্থিত নীলপর্বতে শ্রাবণের পূর্ণিমায় কমলফুল ফোটে। যজমানের অনুরোধে পাণ্ডারা উহা তুলিয়া আনিয়া তুঙ্গনাথকে উৎসর্গ করিয়া ডাক-যোগে প্রেরণ করে। এক একটি কমল আহরণের ব্যয় পাঁচসিকা পড়ে।

তুঙ্গনাথ পঞ্চকেদারের এক কেদার। ইহা উখিমঠের রাওল সাহেবের অধীন কিন্তু কার্যতঃ ইহার তত্ত্বাবধান মকুমঠের গৌড় ব্রাহ্মণদের হাতে। তাঁহারাই ইহার পূজারী ও পাণ্ডা। মঠের নাম হইতে ইঁহারা মকুমঠী বা মৈঠাণী নামে পরিচিত। মকুমঠ বা মর্কটেশ্বর মঠ উখিমঠের সাত মাইল দক্ষিণে ও তুঙ্গনাথ হইতে পনর মাইল দূরে

অবস্থিত। কেদার খণ্ডে ইহার উল্লেখ আছে ও কমলের কথাও আছে। শীতের ছয়মাস তুঙ্গনাথে মন্দির বন্ধ থাকে, তখন মকুমঠে বিগ্রহের নামে পূজা হয়। তথায় একটি সংস্কৃত পাঠশালা আছে, তাহাও ছয় মাসের জন্য তুঙ্গনাথ পাহাড়ে আসে। তুঙ্গনাথে 'পট' বৈশাখে খোলে আর কার্তিকে বন্ধ হয়।

তুঙ্গনাথের দুই মাইল পূর্বে শৈলশিখরে চন্দ্রশেখর শিবের মন্দির।* এখান হইতে আকাশগঙ্গা উৎপন্ন হইয়াছে। তুঙ্গনাথে পট খোলার দিন ও পট বন্ধ হওয়ার দিন পূজারী গিয়া চন্দ্রশেখরের পূজা করিয়া আসে।

তুঙ্গনাথ—মণ্ডল—গোপেশ্বর—চমোলি। ১৭ মাইল

(১৮ই মে)

ভোরে ধর্মশালা ত্যাগ করিয়া দুই ফার্লং চড়াই উঠিয়া পাহাড়ের অন্যদিকের পথে দুই মাইল খাড়া উৎরাই নামিয়া ভুলকনা চটিতে চমোলির পথে ১৫ মাইল ৪ ফার্লং এ পড়িলাম। ঐ পথে আড়াই

*"Tunganath is on the slope of a mountain called Chandra Seyla, 12000 feet. From Chandra Seyla one of the most magnificient views of the world is seen. To the north there is a wall of snow commencing from Jumnotri on the left (west side), passing through Kedarnath, Chankumba and a number of unnamed peaks to the Niti mountain on the east side. To the south-east, Dunagiri, Trisul and Nanda Devi, which latter is nearly 26000 feet high. There are glaciers all round and the scenery is of the wildest description. To the south one looks over ranges upon ranges of hills right away to Pauri in Garhwal, to Ranikhet and to Cheena above Nainital. Very few Englishmen have visited Chandra Seyla, but they number one Lt. Governor—Sir Auckland Colvin—among them." (*Indian Engineering*, 5th Dec., 1903).

মাইল চলিয়া জঙ্গলের মধ্যে এক ছোট চটি পার হইয়া আরও মাইল খানেক চলিলে ১৯ মাইল ষ্টোনের নিকট অলকানন্দার উপনদী বালখিল্য নদীর প্রস্তরবহুল তীরে পৌছিলাম ও তাহা ধরিয়া আড়াই মাইল আন্দাজ নামিয়া নদীতীরস্থ মণ্ডল চটি পাইলাম। এখানে কালিকমলি-বাবার ধর্মশালায় উঠিয়া স্নানাহার করিয়া দুপুরে বিশ্রাম করিলাম।

মণ্ডল চটি হইতে পঞ্চকেদারের অন্তর্গত রুদ্রনাথের স্থানে যাইবার এক পার্বত্য পথ আছে। মাইল বার উত্তরদিকে যাইতে হয়। রুদ্রনাথ গোপেশ্বরের রাওল সাহেবের অধীন।

বিকালে বাহির হইয়া চটির নীচে বালখিল্য নদী পার হইয়া উহার তীরে প্রশস্ত কৃষিবহুল সমতল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া তিন মাইল চলিয়া একটি ছোট নদী পার হইলাম। তারপর তিন পোয়া মাইল চড়াই ও তিন পোয়া মাইল উৎরাই নামিয়া আর একটি নদী পার হইয়া মাইল খানেক চড়াই উঠিলে সামনে গ্রামের মধ্যে গোপেশ্বরের মন্দির দেখা গেল। নীচে বৈতরণী নামে কুণ্ড। এখানে পর্বতগাত্র সাদা মার্বেল পাথরের। কুণ্ডে নামিবার ধাপগুলিও ঐ পাথরে নির্মিত। কুণ্ডে তিনটি সুশ্রী মকরমুখ হইতে জল পড়িতেছে। পাড়ের উপর কয়েকটি ছোট ছোট প্রাচীন মন্দিরে বিষ্ণু, হরগৌরী, গণেশ প্রভৃতি মূর্তি রহিয়াছে। আমরা কুণ্ডের জল স্পর্শ করিয়া মূর্তিগুলি দেখিয়া উপরে উঠিয়া বসতির মধ্যে গোপেশ্বর-মন্দিরের বৃহৎ চত্বরে প্রবেশ করিলাম। সামনে রাওল সাহেবের বাসস্থান ও গদি বা অফিস। রাওল সাহেব জঙ্গম শ্রেণীর। ইহার অধীনে গোপেশ্বর ও রুদ্রনাথ এই দুই দেবস্থান। শীতের ছয়মাস রুদ্রনাথের মন্দির বন্ধ থাকে। তখন গোপেশ্বরেই তাঁহার উদ্দেশে পূজা হয়। রাওল সাহেবের গদির নিকট "স্বতন্ত্র দ্বিতল প্রকোষ্ঠে লক্ষ্মীদেবী আছেন।" চত্বরের মাঝখানে

গোপেশ্বর শিবের বৃহৎ মন্দির। উহার মধ্যে প্রস্তর-নির্মিত অর্দ্ধ-ডিম্বাকৃতি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। অন্য শিবের মত যাত্রীরা ইহাকে স্পর্শ বা আলিঙ্গন করিতে পারে না। চত্বরের উত্তর পূর্ব কোণে এক প্রাচীন লেখযুক্ত বৃহৎ লোহার ত্রিশূল প্রোথিত আছে। উহা ষোল ফুট লম্বা, চারি ইঞ্চ চৌকা ও নানা অস্ত্রে সজ্জিত, তাহার মধ্যে ৭ আকারের একটি তরবারি, যেমন অগস্ত্যমুনিতে দেখিয়াছি। গোপেশ্বরের কথা পরিশিষ্টে আলোচিত হইবে। কেদারখণ্ডে এ স্থানের নাম গোস্থলক্ষেত্র ও এই ত্রিশূল এবং সদা-পুষ্পিত এক বৃক্ষের উল্লেখ আছে। চত্বরের নানাস্থানে সুন্দর সুন্দর প্রাচীন প্রস্তর মূর্তি—অনসূয়া, পরশুরাম, গণেশ ইত্যাদি নামে—বিরাজ করিতেছে। ইহার মধ্যে একটি অতি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি ও একটি সহস্রলিঙ্গ শিবমূর্তি, অর্থাৎ গায়ে সারি সারি ক্ষুদ্র লিঙ্গ খোদা শিবলিঙ্গ দেখিলাম। ঐরূপ আর একটি লিঙ্গ কর্ণপ্রয়াগে দেখি। গোপেশ্বরের মন্দির-চত্বর প্রাচীন নিদর্শনের আকর, বহুক্ষণ ধরিয়া পর্যবেক্ষণের যোগ্য।

কিন্তু আকাশে মেঘ উঠিল, ডাণ্ডি বাহকেরা আরও চারি মাইল আগাইয়া মঠ চটিতে রাত্রি যাপন করিবে বলিয়া আমাদিগকে তাড়া দিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি দেখিয়া লইয়া গোপেশ্বর ছাড়িতে না ছাড়িতেই প্রবল ঝড় উঠিল। উৎক্ষিপ্ত কঙ্কররাশি বাহকদের চোখে মুখে লাগিতে লাগিল। তাহারা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে অপূর্ব দক্ষতার সহিত আড়াই মাইলের উতার নামিয়া চমোলির সামনে অলকানন্দার পুলে পৌছিতে পৌছিতে ঝড় ভীষণ হইল। তখন আর অগ্রসর হওয়া গেল না। নামিবার সময় অলকানন্দার দরিতে হরদ্বারের পথ—সিষ্টর নিবেদিতার কথায়, the canyon-like scenery of the Tibetan road—চোখে পড়িল।

ঝড় পড়িলে আমরা পুল পার হইয়া চমোলিতে কালিকমলি-বাবার এক ধর্মশালায় কষ্টে স্থান পাইলাম। ইহাতে ডাণ্ডিবাহকদের সহরের মত চটিতে রাত্রের মোকাম করার অনিচ্ছা যে কত সঙ্গত তাহা দেখিলাম। আমাদের পৌছানর অল্প পরে সংবাদ আসিল যে ঝড়ের সময় আগুন লাগিয়া নিকটস্থ মঠ চটি—যেখানে আমাদের রাত্রিযাপনের কথা হইয়াছিল—ভস্মীভূত হইয়াছে। দিনান্তে মেথরেরা যে ময়লা কচড়া জ্বালাইয়া দেয় তাহা হইতে এই আগুন লাগে। চমোলিতে পাকশাকের সুবিধা হইল না, বাজারে পুরিও পাওয়া গেল না, অন্য খাবার খাইয়া থাকা গেল। আমাদের অতিরিক্ত মাল এক দোকানদারের নিকট ছাড়া হইল।

চমোলির আর এক নাম লালসাঙ্গা। উহা এদিকের একটি বিশিষ্ট সহর, গড়বাল জেলার এক সবডিভিসনের হেডকোয়ার্টার্স। এখানে ডাকঘর, তারঘর, হাসপাতাল, থানা প্রভৃতি সব আছে। অনেক দোকানও আছে। ইহার নীচে অলকানন্দা বহিতেছে। চমোলি হইতে হরদ্বার ১৩৫ মাইল, কেদারপুরী ৫৩ মাইল, জোষিমঠ ৩০ মাইল, বদরী ৪৮ মাইল।

চমোলি—পিপলকুটি—গরুড়গঙ্গা—গুলাবকুটি।
২০ মাইল (১৯শে মে)

ভোরে বাহির হইয়া অলকানন্দা পার হইয়া পূর্বমুখে চলিলাম। চমোলির পুল ২২০ ফুট লম্বা, ১৮৯৪ সালের গহনা প্লাবনের পর নির্মিত। এখান হইতে হাট গ্রামের কাছে আবার অলকানন্দা পার হওয়া পর্যন্ত পথ উহার উত্তর তীরে গিয়াছে। চমোলি হইতে দুই মাইল পর এক ঝরণার ধারে মঠ চটি পাইলাম। এখানে প্রচুর জল ও চারিদিকে

গাছপালা। অনেকগুলি বড় দোকান ছিল, গত সন্ধ্যায় আগুন লাগিয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে। এখান হইতে বদরী-প্রত্যাগত যাত্রীদের সহিত সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। মাইল দুই পর ছিনকা চটিতে চা পাইলাম। তাহার মাইল খানেক পর বাবলা চটি ও তাহার আধ মাইল পর অপর পারে দক্ষিণ হইতে আসিয়া বিরহিগঙ্গা অলকানন্দায় পড়িয়াছে। এই সঙ্গমের মাইল পাঁচেক উজানে বিরহিগঙ্গার উপর গহনা গ্রাম, যেখানে পাহাড় ধ্বসার ফলে—শ্রীনগরের কথায় বর্ণিত—১৮৯৪ সালের প্রলয়ঙ্কর প্লাবন ঘটে। এখনও সেই হ্রদের কিছু অবশেষ আছে, তাহা নৈনীতালের তিনগুণ। "সতী-বিরহী শোক-সন্তপ্ত মহাদেব নাকি ইহার তীরে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাই ইহার নাম বিরহিগঙ্গা হইয়াছে।"

চলিতে চলিতে লক্ষ্য করিলাম যে অলকানন্দার দুই দিকে খাড়া পাহাড়, তাহার পাদদেশে টিলা নুড়ি ও প্রস্তরখণ্ডময় সমান খানিকটা তীর ভূমি—পুরাকালের গ্লেসিয়রের তলদেশ। ইহার মধ্যে নদীর বর্তমান খাত। নদীর এইরূপ গঠনে হিমালয়ের উত্থানে সৃষ্ট দরি-পথে গঙ্গার প্রথমতঃ গ্লেসিয়র-রূপে আবির্ভাব এবং কালক্রমে জলধারায় পরিণতি ব্যক্ত হইতেছে।

বিরহিগঙ্গা-সঙ্গমের মাইল খানেক পর সিয়া চটি, তাহার এক মাইল পর ধোবীঘাট চটি, তাহার আধ মাইল পর হাট নামে বৃহৎ গ্রামের নীচে অলকানন্দা পার হইয়া প্রায় দুই মাইল চড়াই উঠিয়া পিপলকুটির উচ্চভূমি পাইলাম। হাটের এই পুল আশি ফুট লম্বা, ১৮৯৪ সালের প্লাবনের পরে নির্মিত। ঐ প্লাবন উজানে বহিয়া পূর্বের পুলকে বিদ্ধস্ত করে।

পিপলকুটি ৪৫০০ ফুট উচ্চ। এই মালভূমি conglomerate

নির্মিত ও বৃক্ষহীন, তাই পিপলকুটির মন্দিরের কাছে ফুলে ভরা করবী গাছটি খুব চোখে পড়ে। বসতির উপরে ডাক-বাঙ্গলার কাছে একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে, তাহাতে সিষ্টর নিবেদিতা কয়েকটি প্রাচীন মূর্তির খণ্ড দেখেন। পিপলকুটি এ অঞ্চলের বিশিষ্ট স্থান। এখানে বাজারে সব রকম খাদ্য-দ্রব্য এবং শিলাজিত, নির্বিষা, চামর, মৃগচর্ম, লোমবস্ত্র প্রভৃতি পাওয়া যায়। আমরা এখানে কিছু মেঠাই কিনিয়া লইয়া আরও চারি মাইল আগাইয়া গরুড়গঙ্গা চটিতে কালিকমলি-বাবার ধর্মশালায় উঠিলাম।

নিকটে পথের ধারে গরুড়ের ক্ষুদ্র মন্দির, তাহার নীচে গরুড়গঙ্গাতে স্নানের স্থান। আমরা স্নান ও গরুড় দর্শন করিয়া খাবার কিনিয়া খাইয়া বিশ্রাম করিলাম। গরুড়গঙ্গায় কোন কোন যাত্রী 'গরুড় শিলা' সংগ্রহ করিতেছে দেখিলাম। কেদারখণ্ডে ইহার উল্লেখ আছে। ইহাতে নাকি সাপের বিষ নষ্ট হয়।

বিকালে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকাতে রওনা হইতে বিলম্ব হইল। গরুড়গঙ্গা হইতে কতক চড়াই ও কতক অসমান পথে মাইল দুই পর টঙ্গনি চটি। তথা হইতে এক মাইল অসমান পথ ও এক মাইল উতার নামিলে পাতালগঙ্গা নদীর উপরে এক ক্ষুদ্র চটি। পাহাড় ধ্বসিয়া যাওয়ায় এই উতরাই বড় কঠিন হইয়াছে। তার উপর বৃষ্টির আশঙ্কা। যাহা হউক, আমরা পাতালগঙ্গা পার হইয়া আরও দুই মাইল অগ্রসর হইয়া গুলাবকুটি চটিতে রাত্রের মোকাম করিলাম। আমরা পৌছার পরই বৃষ্টি নামিল। চটির উপরে পাহাড়ের মাথায় বসতি। ইহাতে মুরলী মনোহরের একটি বৃহৎ মন্দির আছে। উহা গুলাব সিংহ নামে কুমাওনের এক রাওতেলার প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার নাম হইতেই গ্রামের নাম হইয়াছে।

গুলাবকুটি—জোষিমঠ—বিষ্ণুপ্রয়াগ—পাণ্ডুকেশর।

১৭ মাইল (২০শে মে)

ভোরে রওনা হইয়া মাইল খানেক চড়াই উৎরাই ও মাইল দুই সমান পথ চলিয়া কুমার চটি বা হেলং পৌঁছিলাম। পথে নগ্ন পর্বতমালার মধ্যস্থিত অলকানন্দার জলধারা উজানে বহুদূর পর্যন্ত সুন্দর দেখা গেল। কুমার চটিতে ডাকঘর, কালিকমলিবাবার ধর্মশালা ও কয়েকটি দোকান আছে। কুমার চটিতে ঝুলায় অলকানন্দা পার হইয়া উত্তরে গেলে উরগম্ গ্রাম পাওয়া যায়, সেখানে পঞ্চকেদারের কল্পেশ্বর ও পঞ্চবদরীর ধ্যানবদরী অবস্থিত।

কুমার চটিতে চা খাইয়া চলিলাম। একটা ঝরণা—নাম কর্মনাশা—পার হইয়া গভীর খাতের কিনারা দিয়া সঙ্কীর্ণ পথে উঠিতে হইল। এখানে বদরী-গামী আটা-বাহী মেষের পাল ও কাঠগুদাম হইতে আগত বড় বড় মালবাহী খচ্চরের দল পথে পড়িল। এখান হইতে বদরী পর্যন্ত প্রায় প্রত্যহ সকালে পথে আমাদের এইরূপ বাধা পড়িত। কোন মতে ইহাদিগকে ছাড়াইয়া তিন মাইল চলিয়া আমরা ঝড়কুলা চটি পাইলাম। মধ্যে দুইটি ছোট চটি পড়িয়াছিল। ঝড়কুলা হইতে অনিমঠ যাইবার পথ আছে। অনিমঠ এ দিকের বিশিষ্ট স্থান, তথায় পঞ্চবদরীর বৃদ্ধবদরী অবস্থিত এবং পার্বতী নাকি পর্ণমাত্র আহার করিয়া তপস্যা করেন। তাই এই অঞ্চলের নাম পর্ণখণ্ড।

ঝড়কুলার মাইল দুই পর সিংহধার চটি। ইহার আধ মাইল পর পথের একটি শাখা বিষ্ণুপ্রয়াগে নামিয়া গিয়াছে, আর একটি জোষিমঠ ডাকবাঙ্গলায় উঠিয়া গিয়াছে। আমরা সোজা আধ মাইল টেক চলিয়া জোষিমঠ সহরে পৌঁছিয়া কালিকমলিবাবার ধর্মশালায় উঠিলাম।

ধর্মশালার অল্প দূরেই মঠ অর্থাৎ বদরীর রাওল সাহেবের বাসস্থান ও দপ্তর, এবং তৎসংলগ্ন নৃসিংহবদরী প্রভৃতি দেবতার স্থান। আমরা মঠে গিয়া প্রথমতঃ দণ্ডধারা বা নরসিংহ-ধারাতে স্নান করিলাম। এই ধারা একটি দালানের মধ্যে দুইটি পিতলের গজমুখ হইতে পড়িয়া কুণ্ডে জমা হইতেছে। স্নানের পর মঠের দেবালয়ে প্রবেশ করিলাম। উখিমঠের মত এখানে কোন উচ্চ বা প্রাচীন মন্দির নাই। সাধারণ এক ঘরে নৃসিংহবদরী প্রভৃতির মূর্তি আছে। শীতের ছয় মাস যখন বদরীনারায়ণের মন্দির বন্ধ থাকে তখন এই নৃসিংহবদরী নাকি তাঁহার পূজা গ্রহণ করেন। এটকিনসন সাহেব লিখিয়াছেন যে এইরূপ প্রবাদ যে এই মূর্তির এক হাত ক্রমশঃ শীর্ণ হইতেছে। মূর্তি বস্ত্রাবৃত থাকায় ইহার কিছু দেখিতে পাইলাম না। নৃসিংহের পূজারী তাঞ্জোর জেলার অধিবাসী স্মার্ত ব্রাহ্মণ। গয়ার নাট্টচেটি মঠ ইহাদের প্রধান কেন্দ্র। বলিলেন পুরুষসূক্ত আবৃত্তি করিয়া নারায়ণের পূজা করি। এই ঘরে রাম, সীতা, উদ্ধব, কুবের প্রভৃতিরও মূর্তি আছে। বাহিরে একটি সুন্দর প্রাচীন শেষশায়ী বিষ্ণুমূর্তি দেখিলাম। কেদারখণ্ডে আছে যে স্থানের নাম জ্যোতির্ধাম ও এখানের নৃসিংহ মন্দিরে প্রহ্লাদ তপস্যা করেন।

মঠ হইতে উহার সামনে বাসুদেব মন্দির-চত্বরে গেলাম। উহা এক উচ্চ মঞ্চের উপর নির্মিত। মন্দিরগুলি সুন্দর ও প্রাচীন, এখন জীর্ণ ও অনাদৃত। মধ্যস্থলে বাসুদেবের মন্দিরে সুন্দর চতুর্ভুজ মূর্তি বিদ্যমান। পূজারী কোয়ম্বাটুর জেলার স্মার্ত ব্রাহ্মণ। চত্বরের চারিধারে কুঠরিতে অষ্টভুজ গণেশ, সূর্য, হর-পার্বতী প্রভৃতির সুন্দর সুন্দর প্রাচীন মূর্তি ও বাসুদেব-মন্দিরের পাশে এক নবদুর্গা মন্দির আছে। বাহিরে বাসুদেবের দিকে মুখ করিয়া একটি পিতলের গরুড় মূর্তি স্থাপিত। জোষিমঠ ৬১০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত।

এ সব দেখার পর শুনিলাম যে এক মাইল দূরে পাহাড়ের উপর জ্যোতিরীশ্বর নামে এখানকার প্রাচীন শিব ও তাঁহার শক্তি নন্দাদেবীর স্থান। তথায় যাইবার জন্য ডাকবাঙ্গলার পার্শ্ব দিয়া পথ ধরিয়া কিছুদূর গেলে একটি লোক পাইলাম, যে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া জ্যোতিরীশ্বরের মন্দিরে লইয়া গেল। মন্দিরটি সামান্য এবং ভগ্নপ্রায় ও অনাদৃত। জ্যোতিরীশ্বর প্রস্তর নির্মিত লিঙ্গ মূর্তি। এখানে এক নূতন প্রথা দেখিলাম। অনাবৃষ্টির জন্য কৃষকেরা কয়েকদিন পূর্বে নালা কাটিয়া জল আনিয়া শিবলিঙ্গ প্লাবিত করিয়া রাখে। গত রাত্রে বৃষ্টি হওয়ায়—যে বৃষ্টি আমরা গুলাবকুটিতে পাই—তাঁহাকে জলমুক্ত করিতেছে। নিকটে একটি মন্দিরের ভিত্তি পড়িয়া আছে, ইহা নাকি পার্বতীর জন্য নির্মিত হইতেছিল। নিকটে একটি সামান্য মত বিষ্ণুমন্দির আছে। দুই বিগ্রহের পূজারী এক স্থানীয় ব্রাহ্মণ।

জ্যোতিরীশ্বর হইতে নন্দাদেবীর মন্দির প্রায় আধ মাইল দূরে, অন্য এক গ্রামে। আমরা ক্ষেতের মধ্য দিয়া গিয়া তথায় পৌঁছিলাম। নন্দাদেবীর মন্দির জ্যোতিরীশ্বরের অপেক্ষা অনেক বড় এবং উহার অবস্থাও ভাল। মূর্তি সাদা মার্বেল পাথরের অষ্টভুজা। তাঁহার কাছে ছাগ বলি হয়। পূজারী স্থানীয় ব্রাহ্মণ। এখানে এক ঘরে মৌমাছি পালিয়া মধু সংগ্রহ করা হয় দেখিলাম। নন্দাদেবী হইতে সোজা পথে ধর্মশালায় নামিয়া, বাজার হইতে খাবার কিনিয়া খাওয়া হইল।

জোষিমঠ এক প্রাচীন স্থান। এখানে নাকি কুমাওনের কত্যুর রাজবংশের আদি রাজধানী ছিল। তাঁহাদের তাম্রশাসনে এ অঞ্চলে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। জোষিমঠ চারিদিকের পথের মিলন-কেন্দ্র এবং বদরীর রাওল সাহেবের আবাস। এখানে ডাকঘর, তারঘর, হাসপাতাল, ডাকবাঙ্গলা ও সব রকম জিনিসের দোকান আছে।

জোষিমঠ হইতে হরদ্বার ১৬৪ মাইল, বদরী ১৯ মাইল। বদরী হইয়া মানা ভুটিয়া-অঞ্চলে যাওয়া যায়। জোষিমঠ হইতে দক্ষিণে কুমাওনে যাতায়াতের পথ আছে। আর এক পথ নিতি ভুটিয়া-অঞ্চলের মধ্য দিয়া তিব্বতে যায়। এই পথের উপর জোষিমঠ হইতে নয় মাইল পূবে তপোবন নামক প্রাচীন স্থান, যেখানে কয়েকটি পুরাতন মন্দির ও উষ্ণ প্রস্রবণ আছে ও যাহার চারি মাইল উজানে অলকানন্দের তীরে পঞ্চবদরীর ভবিষ্যবদরী।

জোষিমঠের পথে নিতি অঞ্চলের এক ভুটিয়ার সহিত আমাদের আলাপ হয়। তাহার নাম সোনিয়া, বেশ হিন্দী বলে। সে নন্দপ্রয়াগ অঞ্চলে শীতকাল কাটাইয়া এখন—পরিবার, ঘর সংসার, গরু বাছুর, তাহাদের চা মন্থন করার মোটা বাঁশের চোঙ্গ, সেলাইয়ের কল—সব লইয়া স্বদেশে চলিয়াছে। সেখানে চাষ আবাদ করিয়া গরমের ছয় মাস থাকিয়া শীতের আরম্ভে নামিয়া আসিবে। ইহাই তাহাদের রীতি। শীতের সময় কেহ তাহাদের দেশে থাকিতে পারে না। তথায় শীত ও গ্রীষ্ম এই দুই ঋতু, বর্ষা নাই। ভুটিয়ারা হিন্দুধর্মাবলম্বী ও অষ্টভুজা নন্দাদেবীর উপাসক, যাহার পীঠস্থান হইতে নন্দাদেবী পর্বতের নাম হইয়াছে। এই ভুটিয়াদের চেহারা ও বেশভূষা গড়বালী কৃষকদের মত অর্থাৎ মোঙ্গলীয় ধরণের নহে। পুরুষেরা আঁট পাজামা ও লম্বা আঙ্গরথা পরে। স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছদ সুতি ঘাঘরা, কোমরে কাপড় জড়ান, গায়ে চোলির উপর কুর্তা, তার উপর কম্বল ঝুলান। মাথায় সাদা সুতি ওড়না, তাহার মাঝখানে কপালের উপর একটু রঙ্গীন কাজ করা।

দুপুরে মেঘাড়ম্বর দেখিয়া দেড়টার সময়ই আমরা বাহির হইলাম। মঠের নিকট গিয়া নিতির পথ ছাড়িয়া বিষ্ণুপ্রয়াগের পথ ধরিয়া নামিতে লাগিলাম। মাইল দুই চলিয়া বিষ্ণুপ্রয়াগের নিকট পৌঁছিতেই প্রবল

ঝড় উঠিয়া পথের উপর গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গমের ভীষণ গর্জন মিশিয়া আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। যাহা হউক, অল্পক্ষণে ঝড় থামিয়া ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। এখানকার পাকা পুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এক কাঁচা পুল নির্মিত হইয়াছে, পথও অনেকটা ধ্বসা। আমরা ডাণ্ডি হইতে নামিয়া অলকানন্দা পার হইয়া অপর তীরের মাথায় বিষ্ণুর ক্ষুদ্র মন্দিরে পৌছিলাম। এখান হইতে সঙ্গম অনেক নীচে। আমরা তথায় নামিলাম না, দেখিলাম অলকানন্দার ঘোলা জলরাশি পূব হইতে আসিয়া পশ্চিমে চলিয়াছে, আর বিষ্ণুগঙ্গার স্বচ্ছ স্রোত তাহার উপর পড়িতেছে। পদ্মনাথ বাবুর কথায়, "একদিক হইতে বিষ্ণুগঙ্গা, অন্যদিক হইতে অলকানন্দা—উভয়েই পর্বতদ্বয়-মধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া যেন আছাড় খাইয়া পড়িয়াছে—দুই স্রোতস্বিনীর সংঘর্ষণে কি এক ভীষণ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য ; গর্জনে কান বধির হইয়া যায়—দর্শনে মস্তিষ্ক ঘুরিয়া যায়।"

সঙ্গমে নদীদ্বয়ের নাম সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক। পদ্মনাথ বাবুর পুস্তকে এবং অন্য কোথায় কোথায় উত্তর-দিকের ধারাকে অলকানন্দা ও তাহার উদ্ভব-দেশ বদরীর উত্তরের মালভূমিকে অলকাপুরী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মেঘদূত প্রভৃতি কাব্য অনুসারে অলকাপুরীর অবস্থান ইহার বহু পূবে—কৈলাসপর্বতের উপর। আর সেই দিক হইতে আসিতেছে বলিয়া সঙ্গমের পূবের ধারাকে—যাহার চলিত নাম ধৌলী—অলকানন্দা বলা উচিত। সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া-কৃত ম্যাপে উত্তরের ধারার নাম বিষ্ণুগঙ্গা। ইহাই ঠিক, কারণ ঐ ধারা বদরী বা বিষ্ণুর ধাম হইতে আসিতেছে।

আমরা বিষ্ণুপ্রয়াগের উপরে পৌছিলে, বৃষ্টি বন্ধ হইল কিন্তু আকাশ

মেঘাচ্ছন্ন থাকিল। যাহা হউক, আমরা অগ্রসর হইলাম এবং অল্পস্বল্প বৃষ্টিও পাইলাম। বিষ্ণুগঙ্গার পূব তীর ধরিয়া মাইল খানেক চলিয়া একটি ঝরণা ও চটি পার হইয়া পাঁচ ফার্লং পর বিষ্ণুগঙ্গা পার হইয়া উহার পশ্চিম তীর ধরিলাম। পাণ্ডুকেশবের উপরের লামবগড় চটি পর্যন্ত আমাদের পথ এই তীরেই থাকিবে। নদীর খাড়া কিনারা দিয়া পাহাড় কাটিয়া পথ চলিয়াছে, আবার প্রকৃতির বিধানে পথচারীদের আশ্রয়ের জন্যই যেন পথিপার্শ্বে মাঝে মাঝে স্বাভাবিক গুহা বা প্রস্তর-আচ্ছাদন রহিয়াছে। নদীর ওপারের তীরও অমনি খাড়া। আড়াই মাইল আন্দাজ চলিয়া বিষ্ণুগঙ্গার তীরে অবস্থিত ঘাট চটিতে পৌঁছিতে মেঘ কাটিয়া গিয়া রৌদ্র বাহির হইল। এখান হইতে কাঠ কাটিয়া বদরীর দিকে পাঠান হয়। তাই চটিটি চির-কাঠের মিষ্ট গন্ধে ভরপুর। ঘাট হইতে দুই মাইল আগাইয়া সাড়ে চারিটার সময় আমরা পাণ্ডুকেশবে পৌঁছিয়া কালিকমলিবাবার ধর্মশালায় রাত্রের মোকাম করিলাম। বদরী পৌঁছিতে ১১ মাইল বাকি থাকিল।

আমি এই স্থানকে পাণ্ডুকেশব বলিয়াছি, কারণ শিবেরই আখ্যা ঈশ্বর, আর এখানে শিবের কিছু নাই, বরং দুই উচ্চ মন্দিরে বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। কেদারখণ্ডে এ স্থানের নাম পাণ্ডুস্থান, আর এখানে পাণ্ডবেরা তপস্যা করেন এবং লিঙ্গের নাম পাণ্ডেশ্বর এই আছে। এখন ঐ লিঙ্গের কোন চিহ্ন নাই। কত্যুরদের তাম্রশাসনেও এ নাম নাই।

পাণ্ডুকেশব বিষ্ণুগঙ্গার তীরে অবস্থিত। ধর্মশালার পিছনে পানিচাক্কির জন্য একটি ধারা থাকাতে জলের বেশ সুবিধা। জলের নলও আছে। এখানে স্থায়ী বড় বসতি ও বাজার আছে। এখান হইতে ভুটিয়া অঞ্চল আরম্ভ হইল। বর্তমান অধিবাসীরা ভুটিয়া, কিন্তু এখানকার সুন্দর প্রাচীন মন্দির দুইটি হয়ত অন্য সভ্যতার স্মৃতি বহন

করিতেছে। আমরা উহা দেখিয়া আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। রাত্রে ধর্মশালায় পট্টু ধার পাওয়াতে শীতে কষ্ট হইল না।

পাণ্ডুকেশবের মন্দির দুইটি বসতির লাগা একটি চত্বরের মধ্যে অবস্থিত। এক সময় চত্বরটি চারিদিকে ঘেরা ছিল, এখন এক দিক লোপ পাইয়াছে, অবশিষ্ট তিন দিক জীর্ণ। মন্দির দুইটির অবস্থাও তদ্রূপ। এক মন্দিরে পঞ্চবদরীর মধ্যে গণ্য যোগবদরীর মূর্তি স্থাপিত। আমরা উহা বস্ত্রালঙ্কারে আবৃত দেখিলাম। পূজারী বলিলেন উহা পদ্মাসনে উপবিষ্ট বা যোগস্থ চতুর্ভুজ মূর্তি, উপরের ডান হাতে শঙ্খ ও বাম হাতে পদ্ম, অর্থাৎ বদরীর পটের অনুরূপ। তাই মনে হয় যে ইহাও বদরীর মত ধ্যানীবুদ্ধ-মূর্তি। মূর্তির সামনে একটি পিতলের গরুড় আছে তাহার নীচে হর্ষ-যুগের অক্ষরে তিন লাইন লেখা আছে। মন্দিরে চারি খানি বৃহৎ তাম্রশাসন দেখিলাম। উহার একখানি বাহিরে রক্ষিত আছে। তাহাতে উপবিষ্ট বৃষের মূর্তি-যুক্ত ও ললিতশূরদেব-নামাঙ্কিত একটি সীল সংলগ্ন আছে। এই ফলকের প্রতিকৃতি এটকিনসন সাহেবের পুস্তকে দেওয়া আছে। পদ্মনাথ বাবু উহার এই বর্ণনা দিয়াছেন—"বৃষমার্কা ফলকখানি সব চেয়ে বড়, পরিমাণ ২৪ ইঞ্চ × ১৮ ইঞ্চ হইবে—ইহাতে প্রায় ৪০টি পংক্তি আছে। প্রত্যেক পংক্তিতে প্রায় ৭০টি অক্ষর।" এই ফলকগুলি ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক পঠিত হয়। পরিশিষ্টে ইহাদের কথা বলা হইবে।

অপর মন্দিরটিতে একটি দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্তি স্থাপিত। উপরের দুই হাতে চক্র ও শঙ্খ। এই দেবস্থান জোষিমঠের রাওল সাহেবের কর্তৃত্বাধীন। বর্তমান পূজারী আয়ার বা স্মার্ত ব্রাহ্মণ, বলিলেন ষোল বৎসর পূর্বে আঠার বৎসর বয়সে ত্রিবাঙ্কুর হইতে এখানে আসেন। আমরা যখন যাই তখন তিনি বেদান্ত-পাঠে নিবিষ্ট ছিলেন।

পাণ্ডুকেশ্বর—হনুমানচটি—বদরীধাম।

১১ মাইল (২১শে মে)

ভোরে রওনা হইয়া গ্রামের বাহিরে এক প্রস্তর-সঙ্কুল ঝরণা পার হইলাম। এখান হইতে পথ খারাপ হইতে লাগিল। মাইল দেড় গিয়া ঝরণার ধারে একটি চটি পার হইয়া আরও দেড় মাইল গিয়া আর একটি ঝরণার ধারে লামবগড় চটি পাইলাম। এখান হইতে বৃক্ষহীন হিম অঞ্চল আরম্ভ হইল। বিষ্ণুগঙ্গার সঙ্কীর্ণ দরির কখন পশ্চিম তীর কখন পূব তীর দিয়া যাইতে হইল। লামবগড় ও বদরীর মধ্যে আট মাইল পথে চারিবার বিষ্ণুগঙ্গা পার হইতে হইল। পথ স্থানে স্থানে ধ্বসা, তার উপর মালবাহী খচ্চর ও মেষের পালে রুদ্ধ।

লামবগড় চটির উপরে ঝুলন পুলে বিষ্ণুগঙ্গা পার হইয়া উহার পূব তীর ধরিয়া মাইল তিনেক গিয়া কাঠের পুলে একটি ঝরণা পার হইয়া বিষ্ণুগঙ্গার উচ্চ তটে হনুমানের ক্ষুদ্র মন্দির ও তৎসংলগ্ন চটি পাইলাম। চটির কিছু আগে হোমকুণ্ড লাগাইয়া একটি লোক যাত্রীদের হোম করিতে ডাকিতেছে। এখানে নাকি মরুৎ রাজা যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

হনুমানের মন্দিরটি আধুনিক। আমরা কালিকমলি-বাবার ধর্মশালায় উঠিয়া, নিকটের ঝরণায় স্নান করিয়া দোকান হইতে খাবার কিনিয়া খাইলাম। দুপুর না হইতেই বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। উহা কিছু কম হইতে আমরা বাহির হইলাম। এখান হইতে বদরী পাঁচ মাইল, মধ্যে কোন চটি নাই, পাহাড়ীদের দুই একটি ঘর আছে।

হনুমান চটির আধ মাইল উপরে একবার এবং তাহার আধ মাইল উপরে আর একবার বিষ্ণুগঙ্গা পার হইয়া উহার পূবতীর ধরিয়া চলিলাম। স্থানে স্থানে বরফ এবং ধ্বসা পিচ্ছল পথ পাইলাম।

মাইল খানেক পর বিষ্ণুগঙ্গা বরফে ঢাকা দেখিলাম, তাহার দেড় মাইল পর পথের কঠিন অংশ শেষ হইল ও তাহার নির্দেশক গণেশের একটি ছোট মন্দির দেখা গেল। কেদারের অনুরূপ স্থানে গরুড় ছিলেন। এখানে আকাশ পরিষ্কার হইল। আমরা দেড় মাইল দূরের বদরীধাম দেখিতে পাইয়া ডাণ্ডি ছাড়িয়া পদব্রজে পাঁচটার সময় তথায় পৌঁছিলাম।

প্রথম পঞ্জাব-সিন্ধুক্ষেত্রের প্রশস্ত ধর্মশালা, তারপর বিষ্ণুগঙ্গার পুল, তারপর উহার উপনদী ঋষিগঙ্গার উপর কাঠের পুল পার হইয়া পথের ধারে ডাকঘর পাইলাম। সেখানে চিঠির খোঁজ করিয়া উহার পাশেই নাকাতে নাম ধাম লিখাইয়া বাজারের মধ্য দিয়া গিয়া মন্দিরের নিকটে কালিকমলি-বাবার ধর্মশালায় উঠিলাম। এখানে পাণ্ডা চন্দাপ্রসাদ আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই ধর্মশালার সহিত দাতব্য ঔষধালয় ও সদাব্রত আছে।

কেদারের মত বদরীধামও বৎসরের অর্দ্ধেক সময় মাত্র খোলা থাকে। তবে এখানে কেদারের মত বসতির মধ্যে বরফ দেখিলাম না। বদরীর উচ্চতা ১০৪৮০ ফুট অর্থাৎ কেদার অপেক্ষা কম, আর এখানে তপ্ত জলের একটি প্রস্রবণ আছে। এজন্য এখানে কেদার অপেক্ষা কম শীত। যাত্রার সময় এখানে ডাকঘর, তারঘর, হাঁসপাতাল প্রভৃতি খোলা হয়। কেদার অপেক্ষা এখানে যাত্রী সমাগম ঢের বেশী, সহরও বড়। বাজারের দুধারে হিমালয়-জাত ও অন্যবিধ নানা দ্রব্যের ও খাবারের বড় বড় দোকান আছে। তাহার মধ্যে নন্দপ্রয়াগের মহেশানন্দ শর্মা এণ্ড সনস্ এর শিলাজিত, পুস্তক, চিত্র ও ব্রচ, কলম প্রভৃতি বদরীর নিদর্শনের দোকান উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা বহু অর্থব্যয়ে কেদারখণ্ডের এক অনুবাদ ছাপাইয়াছেন। এখানকার বাজারে তিব্বতী কম্বল ও অল্মোড়ার পাতলা উনি চাদর দেখিলাম।

বদরীর মন্দির কেদার অপেক্ষা ছোট এবং চারিদিকে লোকালয় থাকাতে দেখিতে তেমন মহান্ নহে। চত্বরের দুইটি দ্বার, দক্ষিণে ও পূবে। মধ্যস্থলে বদরীর মন্দির। উহা তিন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, সামনের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ ও নির্গমের দ্বার। মন্দিরের গর্ভগৃহের ভিত্তি হয়ত প্রাচীন, কিন্তু উপরিভাগ ও সামনের দুই প্রকোষ্ঠ আধুনিক বোধ হইল। চত্বরের চারিদিকের কুঠরীতে লক্ষ্মীর মূর্তি, ভোগের পাকশালা, সংস্থানের দপ্তর এবং গরুড়, পাণ্ডব প্রভৃতির মূর্তি স্থাপিত আছে। চত্বরের পূর্ব দ্বার দিয়া বাহির হইয়া অনেক কয়টি মার্বেল পাথরের খাড়া ধাপ নামিলে বিষ্ণুগঙ্গার তীরে তপ্তজলের কুণ্ডগুলি পাওয়া যায়।

আমরা কুণ্ডের জলে হাত পা ধুইয়া মন্দির খুলিলে নিজেরাই তাহার মধ্যে গিয়া বদরীনারায়ণকে দর্শন করিলাম। যাত্রীদের সহিত পাণ্ডা বা তাহার লোকের মন্দিরে ঢুকিবার অনুমতি নাই। যাত্রীরা কেদার বা জগন্নাথের মত বদরীকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক তাঁহার কোঠাতেই প্রবেশ করিতে পারে না। একমাত্র রাওল সাহেব বিগ্রহকে স্পর্শ করেন এবং তাঁহাকে শৃঙ্গার ও পূজাদির দ্রব্য আগাইয়া দিবার জন্য একজন পরিচারক ব্রাহ্মণ মণিকোঠাতে থাকে। তাহার সামনের কোঠায় থালা লইয়া কর্মচারীরা বসেন। যাত্রীরা এই থালাতে বদরীর উদ্দেশে যাহা ইচ্ছা দিতে পারে। এই পর্যন্ত যাত্রীদের গতি। সন্ধ্যার সময় বিগ্রহ বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত ছিলেন। তাঁহার অবয়ব কিছু বুঝা গেল না। পরদিন সকালে স্নানের সময় উহা উত্তমরূপে দেখি। নারায়ণের আশপাশে অনেকগুলি মূর্তি আছে।

কেদারের মত এই মন্দিরেও 'অখণ্ড জ্যোতি' জ্বলে, অর্থাৎ শীতের আরম্ভে মন্দির বন্ধ করার সময় যথেষ্ট ঘৃত দিয়া ভিতরে এক প্রদীপ

জ্বালিয়া দেওয়া হয়। ছয় মাস পর যখন মন্দির খোলা হয় তখনও নাকি উহা জ্বলিতে দেখা যায়। ঐ সময় আসিয়া উহা দেখা এক ভাগ্যের কথা। আমরা পট খোলার নয় দিন পরে পৌঁছি।

মন্দির হইতে ফিরিয়া দোকান হইতে খাবার কিনিয়া খাইয়া শয়ন করিলাম। রাত্রে খুব শীত লাগিল। ধর্মশালা হইতে পট্টু ধার পাওয়া গেল এবং ডাণ্ডিবাহকদিগকেও কম্বল ধার দেওয়ান হইল। আরতি দেখিতে যাই নাই। আরতির পর একটি লোক আরতির দীপ হইতে প্রবর্তিত দীপ আনিয়া ছোঁয়াইয়া গেল।

বদরীধাম

(২২শে মে)

রাত্রে বৃষ্টি হইয়া সকালে আকাশ পরিষ্কার হইল। আমরা স্নানের জন্য তপ্তকুণ্ডে গেলাম। গৌরীকুণ্ডের মত এখানেও তুষার-শীতল নদীর স্রোতের সন্নিকটে উষ্ণজলের প্রস্রবণ। প্রধান কুণ্ডটি ১৬ ফুট × ১৫ ফুট × ৪ ফুট, এবং উচ্চ ছাদ দিয়া ঢাকা। উহাতে তপ্তজলের মোটা ধারা পড়িতেছে। উদ্বৃত্ত গরম জল বাহির হইয়া উত্তরদিকে বিষ্ণুগঙ্গার প্রস্তরময় পাড়ে তিন চারিটা সঙ্কীর্ণ গভীর কুণ্ডে পড়িতেছে। এগুলির নাম গৌরীকুণ্ড, নারদকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড ইত্যাদি। কেদারখণ্ডে প্রস্রবণটির নাম কূর্মধারা ও কুণ্ডগুলির অন্য অন্য নাম আছে। তপ্ত কুণ্ডগুলির কয়েক ধাপ নীচেই বিষ্ণুগঙ্গার সদ্যঃ তুষার-জাত শীতল জল-স্রোত বহিতেছে।

তপ্তকুণ্ডে স্নান সারিয়া আমরা মন্দিরে গেলাম। ভাগ্যক্রমে তখন নারায়ণের স্নানের আয়োজন হইতেছিল, বহু যাত্রী সমাগত হইয়াছিল। অল্পক্ষণ পরে আড়ম্বরের সহিত রাওল সাহেব আসিলেন। তাঁহার রং ফরসা এবং তীক্ষ্ণ নাসা ও চাপদাড়ি-মণ্ডিত মুখ। ইনি

ত্রিবাঙ্কুরের নম্বুরী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। লম্বা গরম জামা পরিয়াছিলেন। এত দিন রাওল সাহেব প্রতিষ্ঠানের একরূপ সর্বময় কর্তা ছিলেন। সম্প্রতি যুক্ত প্রদেশীয় (কংগ্রেসী) গবর্ণমেণ্ট আইন পাশ করিয়া ইঁহার ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছেন।

রাওল সাহেব আসিয়া স্নানের জন্য বিগ্রহের সমস্ত বস্ত্র ও অলঙ্কার সরাইলেন। এই সময় এক যাত্রী উহার উপর বিজলি বাতির আলোক ফেলিল। আমরা স্পষ্ট দেখিলাম যে মূর্তিটি প্রায় দুই হাত উচ্চ কাল পাথরের দ্বিভুজ ধ্যানী-বুদ্ধ মূর্তি, হাত দু'খানি কোলে একত্র করিয়া উপবিষ্ট। বাম কাঁধের নিকট একটি পদ্মকোরক অঙ্কিত, আর কোন অলঙ্কার বা আয়ুধ নাই। ইহা দেখিয়াই ভক্তবৃন্দ 'জয় চতুর্ভুজ ভগবান' 'জয় বদরী বিশাল' বলিয়া হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। সেক্সপিয়র সত্যই বলিয়াছেন, "Love looks not with the eyes, but with the mind." নর ও নারায়ণ নামের মূর্তি দুইটিও বুদ্ধ-মূর্তি বলিয়া বোধ হইল। বদরীনারায়ণের প্রচলিত চিত্র যে মূর্তির অনুরূপ নহে তাহা পদ্মনাথবাবুও ধরিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"(দেবপ্রয়াগে) চিত্রপট দেখিয়াই বুঝিলাম উহা কল্পিত। উপরের হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও পদ্ম, নীচের হস্তদ্বয় ধ্যানাবস্থার সূচক। মূর্তিতে চক্র ও গদার অভাব দেখিয়া উৎপ্রেক্ষা করিলাম যে অস্ত্র আইনের ভয়েই বুঝি নারায়ণও শঙ্খপদ্মমাত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।" বদরীর মূর্তির আশে পাশে নরনারায়ণ, নারদ, লক্ষ্মী, কুবের, উদ্ধব ও গণেশের মূর্তি স্থাপিত আছে। এই সব লইয়াই বদরীর পঞ্চায়তন মূর্তি। পঞ্চকেদারের অনুকরণে পঞ্চ-বদরী কথা প্রচলিত আছে, যদিও কেদারখণ্ডে ইহার কোন উল্লেখ নাই। পরিশিষ্টে ইহাদের কথা বলা হইবে।

নারায়ণের স্নান আরম্ভ হইতেই আমরা পিণ্ডদানের জন্য মন্দির

হইতে বাহির হইয়া সহরের উত্তরে বিষ্ণুগঙ্গার তীরে ব্রহ্মকপালে গেলাম। ইহার উল্লেখ কেদারখণ্ডে আছে। এখানে পুরোহিত স্বতন্ত্র—দেবপ্রয়াগবাসী পাণ্ডাদিগের কোন অধিকার নাই। পিণ্ড-দানের জন্য নারায়ণের প্রসাদ ও অন্যান্য দ্রব্য এইখানে কিনিয়া দশ বারজন যাত্রীর সহিত একত্র বসিয়া এক পুরোহিতের অনর্গল মন্ত্র আওড়ানের সহিত পিণ্ডদান-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। আমার মাতা-ঠাকুরাণী তখন জীবিত ছিলেন, আমাকে শুধু পঁচিশ বৎসর পূর্বে পরলোকগত পিতৃদেবের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে হইল। সেই সময় তাঁহার বদরী-দর্শনের অপূর্ণ বাসনার কথা মনে উঠিল। দক্ষিণাস্বরূপ প্রত্যেক যজমানকে পাঁচসিকা দিতে হইল। দুই এক জন তাহা দিতে না পারিয়া পুরোহিতের নিকট সুফল পাইল না। পিণ্ডদানের পর কয়েক ধাপ নামিয়া বিষ্ণুগঙ্গায় ব্রহ্মকুণ্ডে তর্পণ করিয়া উপরে ফিরিয়া এক যজ্ঞকুণ্ডে কিছু আহুতি দিয়া যাইবার প্রথা আছে।

বাসায় ফিরিয়া রন্ধন করা হইল এবং বেলা প্রায় দুইটার সময় পাণ্ডাজি নারায়ণের প্রসাদ পাঠাইলে আমরা আহার করিলাম। কেদারের মত বদরীর প্রসাদ স্থানীয় লাল চাউলের অন্ন। ইহার সঙ্গে পাণ্ডাজিরা বেসনের কাড়ি, তরকারি, পাপর প্রভৃতি প্রসাদ বলিয়া দেন। উহা বাজার হইতে আসে। আমরা পূর্বেই পাণ্ডাজিকে ঐ-সব দিতে নিষেধ করি। জগন্নাথের মত বদরীর প্রসাদ শুকাইয়া পাণ্ডাজিরা মহাপ্রসাদ বলিয়া যাইবার সময় যাত্রীদিগকে দেন। ডাণ্ডিবাহক প্রত্যেককে তীর্থ-প্রাপ্তির ভোজনের জন্য আট আনা ও পরের দুইদিন 'বৈঠক রোজ' বাবদ আট আনা দেওয়া হয়।

বিকালে বাহির হইয়া আমরা মহেশানন্দের দোকানে কিছু পিকচার পোষ্টকার্ড ও বদরীর চিত্রযুক্ত ব্রুচ, সিগারেট কেস, কলম

প্রভৃতি উপহারের দ্রব্য কিনিলাম। সবই জর্মানি বা ফ্রান্সে প্রস্তুত। দুঃখের বিষয়, এইরূপ দেশীয় দ্রব্য কিছু নাই। ডাণ্ডিবাহকদিগের জন্য এখানে ধর্মশালাতে নোট ভাঙ্গাইয়া লইলাম।

পরদিন বসুধারা দেখিয়া আসিয়া বিকালে নামিয়া যাইব মনে করিয়া রাত্রেই পাণ্ডা চন্দাপ্রসাদজির নিকট সুফল লইলাম। পাণ্ডাজি দক্ষিণার বাবদ অনেক কথা বলিলেন আমরা কিন্তু আমাদের অন্য খরচের বাহুল্যহেতু তাঁহাকে তেমন দক্ষিণা দিতে পারিলাম না। তাহা লইয়াই তিনি সুফল দিয়া গেলেন। আমরাও আমাদের যাত্রার শেষ-লক্ষ্য সিদ্ধ হইল এবং ফেরার খরচ হাতে থাকিল বলিয়া নিশ্চিন্ত-মনে শয়ন করিলাম।

বসুধারা দর্শন।

(২৩শে মে)

বসুধারা বদরীধামের মাইল ছয়েক উজানে বিষ্ণুগঙ্গার উত্তর অর্থাৎ বিপরীত তীরে অবস্থিত। আমরা কিছু খাবার সঙ্গে লইয়া গিরিধারী কুলীর সহিত সকাল ছয়টায় পদব্রজে রওনা হইলাম। মাইল দেড় গিয়া মানা (শুদ্ধ নাম নাকি মনিভদ্রপুর) গ্রামের এ পারে পৌছিলাম। ভুটিয়ারা আসিয়া পথের ধারে তাম্বু খাটাইয়া তাহাদের ক্ষেতে চাষ আবাদ আরম্ভ করিয়াছে দেখিলাম। আমাদের উচিত ছিল এইখানে ডাহিনে নামিয়া বিষ্ণুগঙ্গা পার হইয়া মানা গ্রামের মধ্য দিয়া পথ ধরা। আমরা ভুল বুঝিয়া বাম দিকে মোড় নিয়া নদীর তীর ধরিয়া মাইল খানেক চলিলে এক সঙ্কটে পড়িলাম। সামনে রাস্তার চিহ্ন নাই. দুই দিকে খাড়া তীর, তার মধ্যে বিষ্ণুগঙ্গার স্রোত বরফে আবৃত। মরিয়া হইয়া অতি কষ্টে উহা পার হইয়া ওপারে উঠিয়া ঠিক পথ ধরিলাম। এখান হইতে বসুধারার গিরিকন্দর দেখা যায় বটে, কিন্তু

সেখানে পৌছিতে আমাদিগকে প্রায় তিন মাইল প্রস্তর-সঙ্কুল ও স্থানে স্থানে বরফে আবৃত পথ ভাঙ্গিতে হইল। পথের ঝরণা সব জমিয়া আছে, আমাদের সঙ্গেও জল নাই, এজন্য পিপাসায় দারুণ কষ্ট পাইতে হইল। কোনক্রমে চলিয়া বসুধারার নিকটে পৌছিতে বরফের একটা ময়দান পড়িল। ইহা পার হইয়াই আমার সঙ্গিনী snow-blind হইয়া মাথা ঘুরিয়া শুইয়া পড়িলেন। বসুধারার কুণ্ড হইতে জল আনিয়া মুখে চোখে দিলে ভগবৎ-কৃপায় তিনি সুস্থ হইলেন। তারপর অবশিষ্ট চড়াই উঠিয়া নিকটে গিয়া বসুধারা দেখিলাম। তখন বেলা এগারটা।

একটি বরফের নদী পাহাড়ের মাথা হইতে নামিয়া আসিয়া তাহার পাদদেশে গলিয়া একটি জলকুণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে। উহার পার্শ্বে এক জলধারা পাহাড়ের মাথা হইতে পড়িয়া অর্দ্ধ পথে জলকণায় পরিণত হইতেছে ও বায়ু-তাড়িত হইয়া এপারে কুণ্ডে স্নানরত যাত্রীদের মাথায় পড়িতেছে। ইহাই বসুধারা। এখানে ঘর করিয়া জন দুই সাধু আছেন।

কুণ্ডের জল স্পর্শ করিয়া ও জলযোগ করিয়া বেলা বারটার সময় আমরা ফিরিয়া চলিলাম। এবার বিষ্ণুগঙ্গার উত্তর তীরে মানার পথ ধরিলাম। উহাও সহজ নহে। বেলা আড়াইটায় বিষ্ণুগঙ্গার উপনদী সরস্বতীর তীরে পৌছিলাম। এখানে বিশাল এক খণ্ড পাথর ধ্বসিয়া পড়িয়া পাহাড়ের গায়ে বাধিয়া আছে। এই স্বাভাবিক পুলের নীচ দিয়া সরস্বতীর স্রোত ভীমবেগে বহিয়া নিকটে বিষ্ণুগঙ্গায় পড়িতেছে। আশপাশের গিরিগাত্র এমন ঝুলিতেছে যে ভয় হয় কখনবা ধ্বসিয়া পড়ে। ঐ স্বভাবজাত পুলে সরস্বতী পার হইয়া, একটা ঝরণায় জল পান করিয়া আমরা মানা গ্রামে পৌছিলাম। পদ্মনাথ বাবু লিখিয়াছেন, "ইহার নিকটেই গণেশগুহা। কথিত আছে যে ব্যাসদেব ও গণেশ এখানে বসিয়া পুরাণাদি লিখিয়াছিলেন।" মানা গ্রামের মধ্য দিয়া

চলিয়া সাড়ে তিনটার সময় বিষ্ণুগঙ্গার তীরে উপস্থিত হইলাম। এখানে কোন পুল নাই। নদীর উপর বরফ জমিয়া পুলের আকার ধরিয়াছে, নীচে জলের স্রোত চলিয়াছে। এখানে নদী পার না হইলে আরও দেড় মাইল ভাটিতে বদরীর নীচের পুলে পার হইতে হয়। তাহা না করিয়া অতি সন্তর্পণে বরফের উপর দিয়াই নদী পার হইলাম ও সকালের পথ ধরিয়া সাড়ে চারিটার সময় শ্রান্তদেহে ধর্মশালায় ফিরিলাম।

সেরাত্রি বদরীতেই থাকিলাম, আমাদের ত্রি-রাত্রি বাস হইয়া গেল। সকালে আমাদের কুঠরি খালি করিয়া যাই। ফিরিয়া তাহা পাইলাম না, চন্দাপ্রসাদজির যাত্রী-নিবাসে রাত্রে অবস্থান করিলাম।

বদরীধামের আঠার মাইল উত্তর-পশ্চিমে সত্যপথ নামক মানার ভুটিয়াদের তীর্থস্থানে, এক ত্রিকোণ হ্রদে বিষ্ণুগঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। এখানে নাকি কয়েকজন সাধু থাকেন।

বদরী—পাণ্ডুকেশব—১৬০ মাইল চটি। ২৩ মাইল

(২৪শে মে)

এইবার নামার পালা। সকাল সাড়ে পাঁচটায় নারায়ণের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া আমরা বাহির হইলাম। হনুমান চটিতে জলযোগ করিয়া সাড়ে আটটায় পাণ্ডুকেশবে পৌঁছিলাম। সেখানে স্নানাহার করিয়া দেড়টার সময় বাহির হইয়া চারিটার সময় বিষ্ণুপ্রয়াগে অলকানন্দা পার হইয়া ওপারের চড়াই ধরিলাম। চড়াইয়ের মাথা যেন আকাশে ঠেকিয়া আছে। খানিক উঠিয়া সিংহদ্বারের শাখা পথ ধরিয়া মাইল খানেক উঠিয়া চমোলির পথ পাইলাম এবং সিংহদ্বার চটি পার হইয়া আড়াই মাইল আন্দাজ চলিয়া ঝড়কুলা চটিতে পৌঁছিলাম। তাহা যাত্রীপূর্ণ দেখিয়া আরও এক মাইল অগ্রসর হইয়া ১৬০ মাইল ষ্টোনের নিকট চটিতে রাত্রের মোকাম করিলাম।

১৬০ মাইল চটি—পিপলকুটি—চমোলি। ২৫ মাইল

(২৫শে মে)

ভোর সাড়ে চারিটায় রওনা হইয়া গুলাবকুটিতে চা খাইয়া লইয়া পাতাল গঙ্গার ধ্বসা চড়াই ও তারপর গরুড়গঙ্গা চটি পার হইয়া বেলা এগারটার সময় পিপলকুটিতে পৌছিলাম।

সেখানে বাজার-চত্বরে এক দোকানে উঠিয়া স্নানাহার করিয়া বিকাল তিনটার সময় বাহির হইলাম। হাট গ্রামের নিকট অলকানন্দা পার হইয়া উহার উত্তর তীর ধরিয়া চলিয়া সন্ধ্যা ছয়টায় উহা আবার পার হইয়া চমোলিতে পৌছিলাম। এখানের দুই ধর্মশালা যাত্রীতে পূর্ণ দেখিয়া এক দোকান ঘরে উঠিয়া পাকশাক করিয়া খাইয়া রাত্রে থাকিলাম। ভোরে রওনা হইব বলিয়া দোকান হইতে আমাদের অতিরিক্ত জিনিসের পুঁটলিটি লইয়া রাখিলাম।

চমোলি—নন্দপ্রয়াগ—সোণলা—কর্ণপ্রয়াগ। ২০ মাইল

(২৬শে মে)

চমোলি হইতে আমাদের নূতন পথ আরম্ভ হইল। ভোর পাচটায় রওনা হইয়া অলকানন্দার দক্ষিণ দিকের তীরের উচ্চ ভূমি দিয়া চলিলাম। এখানে উপত্যকা প্রশস্ত ও শস্যশালী। চটির ঘর-বাড়ী উৎকৃষ্ট ধরণের ও পরিষ্কার। সিষ্টর নিবেদিতাও ইহা লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন যে এদিকে যেন কৃষকগণ হঠাৎ সুশ্রী হইল, কতকটা কাশ্মীরীদের মত। ইহা বোধহয় নন্দপ্রয়াগের মধ্য দিয়া কুমাওনের কত্যুর অঞ্চলের সহিত এই অঞ্চলের সংশ্রবের ফল। চমোলির দুই মাইল পর কুহেড়া চটি, তাহার দুই মাইল পর মাটিয়ালা চটি। সেখানে পুল ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে হাঁটিয়া ঝরণা পার হইয়া তিন মাইল চলিয়া বেলা আটটায় নন্দপ্রয়াগে পৌছিলাম।

নন্দপ্রয়াগের দোকান ঘরগুলি ফিট্‌ফাট্‌। উহাদের দরজার খোদাই-করা চৌকাঠ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে বিখ্যাত মহেশানন্দ এণ্ড সনস্‌-এর মূল দোকান এবং অন্য লোকেরও দোকান আছে। কিন্তু যাত্রার জন্য বদরীতে দোকান খোলায় এখানের অনেক দোকানই বন্ধ। বাজারের উপর ডাণ্ডি রাখিয়া পাহাড়ের গা দিয়া অনেকটা নামিয়া গিয়া প্রস্তর-বিকীর্ণ সমতল ভূমিতে সঙ্গম পাইলাম। এখানে নন্দাকিনী পূব দিক হইতে আসিয়া অলকানন্দার সহিত মিশিয়াছে। এ সঙ্গমে জলের বেশী আলোড়ন নাই। প্রসিদ্ধ নন্দাদেবী শৃঙ্গে উৎপন্ন বলিয়া নন্দাকিনীর এই নাম, এবং তাহা হইতে সঙ্গমের নাম নন্দপ্রয়াগ। সঙ্গমের নিকটে কয়েকটি ভাঙ্গা মন্দির। একটিতে শিবলিঙ্গ, একটিতে জম্ভল বা কুবের ইত্যাদি আছে। বোধ হয় ৪৫ বৎসর পূর্বে গহনা প্লাবনে দেবস্থানটির এই দশা হয়।

সাড়ে নয়টায় উপরে ফিরিয়া আমরা আমাদের পথ ধরিলাম। একটি শুষ্ক ঝরণার পরে নন্দাকিনীর পুল পার হইলাম। এখান হইতে এক পথ দক্ষিণে অল্মোড়া সহরের উত্তরস্থ কত্যুর পরগণার বৈজনাথ বা গরুড় গ্রামে গিয়াছে। দুই অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াতের ইহাই সোজা পথ। উহা ৪৭ মাইল লম্বা এবং ঘাট, থরালি ও গয়লদাম গ্রাম ইহার উপর পড়ে। জল ও চটির সুবিধা নাই বলিয়া স্থানীয় যাত্রীরা মাত্র এই পথ ব্যবহার করেন। গরুড় হইতে অল্মোড়া ও রাণীখেতে মোটর বাস্‌ চলে। আমরা পরে কুমাওন-ভ্রমণে ইহার সাহায্য লই।

নন্দপ্রয়াগ হইতে গ্রীষ্মের তাপ পাইতে লাগিলাম। অলকানন্দার তীর ধরিয়া আড়াই মাইল আন্দাজ চলিয়া প্রায় দুপুর বেলা সোণলা চটিতে এক দোকান ঘরে উঠিলাম। চটির সামনে এক বিস্তৃত ভূমিতে একটি মন্দির ও আম বাগান আছে। সোণলাতে ডাকবাঙ্গলাও আছে।

বিকাল তিনটায় সোণলা চটি হইতে বাহির হইয়া চারি মাইল উৎরাই-খাড়াই ভাঙ্গিয়া নন্দাকিনীর উপত্যকা ছাড়িয়া পিণ্ডরের উপত্যকায় লঙ্গাসু চটিতে পৌছিলাম। তার দুই মাইল পর জয়কণ্ডি চটি—যেখানে জল নাকি উৎকৃষ্ট—তার দুই মাইল পর দুই খণ্ড উমটা চটি পার হইয়া দুই মাইল চলিয়া সন্ধ্যাকালে কর্ণপ্রয়াগে বৃহৎ মন্দিরের সামনে পৌছিলাম।

এখানে ডাণ্ডি রাখিয়া পথের ধারে উমা দেবীর মন্দির ও নীচে মহাদেবের মন্দির হইয়া সঙ্গমে গেলাম। এখানে পিণ্ডর নদ পূর্ব দিক হইতে আসিয়া অলকানন্দায় মিশিয়াছে। এখানেও জলের বেশী আলোড়ন নাই। সঙ্গমে জল স্পর্শ করিয়া উপরে ফিরিয়া অনেক ধাপ সিঁড়ি চড়িয়া কর্ণের মন্দিরে গেলাম। মন্দিরটি বৃহৎ এবং দেবপ্রয়াগ ও রুদ্রপ্রয়াগের মন্দিরের মত সঙ্গমের অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত। কেদারখণ্ডে এ স্থানের নাম শিবক্ষেত্র এবং কর্ণ এখানে তপস্যা করেন এই কথা আছে। অন্ধকারের জন্য মন্দিরের মধ্যের মূর্তিগুলি ভাল দেখা গেল না। বাহিরে সূর্য, বিষ্ণু, সহস্র-লিঙ্গ শিব, বৃষ, চতুর্মুখ শিব প্রভৃতির বহু প্রাচীন মূর্তি পড়িয়া আছে।

এখান হইতে চলিয়া পিণ্ডরের পুল পার হইলাম। এই পুলের নির্মাণ-কৌশলে বৈশিষ্ট্য আছে। ইহা ঝুলন পুল, কিন্তু সহরের দিকের তীরে রজ্জু বাঁধিবার উচ্চ স্থান না থাকায় রজ্জুর বদলে মোটা লোহার পাটি ব্যবহার করিয়া ঝুলন পুলের অর্দ্ধ আকারে নির্মিত।

পুল পার হইয়া পথ অলকানন্দার তীর ধরিয়া পশ্চিমে রুদ্রপ্রয়াগ হইয়া হরদ্বারে গিয়াছে। আর উহার এক শাখা পিণ্ডরের তীর ধরিয়া দক্ষিণ-মুখী হইয়া মেলচৌরি হইয়া রাণীখেতে ও রামনগরে গিয়াছে। পরদিন সকালে আমরা এই পথ ধরিব বলিয়া উপরে বাজারের মধ্যে কালিকমলি-বাবার ধর্মশালায় রাত্রের মোকাম করিলাম।

কর্ণপ্রয়াগ হইতে বদরী ৬৭ মাইল, রুদ্রপ্রয়াগ ২১ মাইল ও তথা হইতে হরদ্বার ৯৫ মাইল, দক্ষিণে মেলচৌরি ২৯ মাইল। কর্ণপ্রয়াগের উচ্চতা ২০০০ ফুট, মেলচৌরির পথ ধরাতে এই দুই প্রয়াগের মধ্যের পথটুকু আমাদের দেখা হইল না। ইহার উপর কর্ণপ্রয়াগের পাঁচ মাইল পশ্চিমে গোচর চটিতে উড়াজাহাজ নামে, আর রুদ্রপ্রয়াগের চারি মাইল উজানে কাকর-কুদনি অর্থাৎ মৃগ-ঝাঁপ বলিয়া অলকানন্দার এক গভীর খাত আছে *। ভীরি চটিতে মন্দাকিনীরও এইরূপ খাত দেখি।

কর্ণপ্রয়াগের বাজারে গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরীর জল বিক্রয় হয়। এখানে নলের জলের সোঁতা গন্ধ। পরদিন উজাল চটি পর্যন্ত দশ মাইল পথে গাড় নদীর উপত্যকায়ও জলে আমরা এই গন্ধ পাই। অলকানন্দার জল সুস্বাদু, কিন্তু রাত্রে তাহা আনার সুবিধা হইল না। পরিশ্রমে ও গরমে ডাণ্ডিবাহকেরা এখানে এলাইয়া পড়িল। আরও ৬০ মাইল না গেলে তাহাদের নিষ্কৃতি নাই।

কর্ণপ্রয়াগ—আদিবদরী—জঙ্গলচটি। ১৭ মাইল

(২৭শে মে)

সকাল পাঁচটায় মেলচৌরি অভিমুখে রওনা হইলাম। যে কলনাদিনী গঙ্গা নানা শাখায় এবং নানা রূপে এক মাস ধরিয়া আমাদের সঙ্গে ছিল আজ তাহাকে ছাড়িয়া আমরা অন্য মুলুকে চলিলাম। কর্ণপ্রয়াগ ছাড়িতেই ডাহিনে পৌড়ীর পথ বাহির হইয়া গেল। তাহার দুই মাইল পর পডলি চটি ও আরও দুই মাইল পর সেমলি চটি, যেখানে দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া গাড়—এদিকে নদীর সাধারণ নাম—পিণ্ডরে

* "A limestone gorge about 100 feet wide with sheer vertical sides 200 feet perpendicular, through which the whole of the Alakananda goes."

পড়িয়াছে। আসার সময় আমরা দেখিলাম যে নদীর স্রোতে ভাসাইয়া নামানর জন্য পিণ্ডরের ধারে কাঠের স্লিপার রাখা আছে।

সেমলি চটিতে পিণ্ডরের তীর ছাড়িয়া দিয়া আমরা গাড়ের পশ্চিম তীরে চলিলাম ও মাইল খানেক পর উহা পার হইয়া সাড়ে পাঁচ মাইলের এক চড়াই ধরিলাম। দেড় দেড় মাইল পর সিরোলি, ভটোলি ও উজাল চটি—যেখানে জল সুস্বাদু—পার হইয়া মাইল খানেক উঠিলে এক পিয়াওর নিকট চড়াই শেষ হইল। তথা হইতে দেড় মাইল উৎরাই নামিয়া (কর্ণপ্রয়াগ হইতে বার মাইল দূর) আদিবদরীতে পৌঁছিলাম।

এ লাইনে কালিকমলি-বাবার ধর্মশালা নাই। তবে গড়বাল জেলার অন্তর্গত সব চটিতে নলের জল ও মলত্যাগের স্থানের ব্যবস্থা আছে। মন্দিরের সংলগ্ন সরকারী ধর্মশালায় আমরা উঠিলাম। এখানে মাছির খুব উপদ্রব। আমরা মাছি তাড়াইয়া ঘর একেবারে অন্ধকার করিয়া তবে বিশ্রাম করিতে পারিয়াছিলাম। ধর্মশালার কাছেই ডাকবাঙ্গলা।

আদিবদরীতে এক খোলা চত্বরে অনেক কয়টি ছোট বড় মন্দির আছে। উহারা ছয় ফুট হইতে বিশ ফুট তক উচ্চ এবং একই ধরণে গঠিত। কাহারও জগমোহন নাই অথবা শিখর ঢাকা নয়। এই সুন্দর মন্দিরগুলি কত্যুর রাজদের কোন এক শাখার কীর্তি বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাদের বর্তমান অবস্থা ভাল নহে। নিকটের থাপলি গ্রামে ইহাদের জন্য গুঁট আছে। ঐ গ্রামের দুই ঘর ব্রাহ্মণ ইহার পূজারী।

মন্দিরগুলির মধ্যে আদিবদরীর মন্দির সব চেয়ে বড়। উহার সামনে থাম্বার উপরে ছাদ দিয়া ঢাকা একটু স্থান আছে। তাহার দুই পাশে বুন্দেলখণ্ডী ধরণের হেলান পাথরের প্যানেল লাগান। আদিবদরী মূর্তি মোটেই বদরীনারায়ণের মত নহে—উহা গদা-পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-ধারী বৃহৎ চতুর্ভুজ মূর্তি।

আদিবদরীর সামনের মন্দিরে আদিকেদার নামে শিবলিঙ্গ। অন্ত মন্দিরগুলিতে দণ্ডায়মান অন্নপূর্ণা, মহিষমর্দিনী, গরুড়ের উপর লক্ষ্মীসহ উপবিষ্ট চতুর্ভুজ নারায়ণ ইত্যাদি মূর্তি আছে। লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্তিটি চমৎকার।

বিকালে আদিবদরী হইতে বাহির হইয়া ছয় মাইলের এক চড়াই ধরা গেল। উহা গাড় ও রামগঙ্গার উপত্যকাদ্বয়ের শীর্ষে দেউলখাল ঘাটিতে শেষ হইবে। তিন মাইল পর খেত্তি চটি, তার দুই মাইল পর জঙ্গল চটিতে পৌঁছিয়া তথায় রাত্রের মোকাম করিলাম।

এ চটি বাস্তবিক জঙ্গলের মধ্যেই। ইহার কাছে ডিমডিমা গ্রামে বনবিভাগের এক বাঙ্গলা আছে। এখানে লোকদের চালচলন ও পরিচ্ছদ জংলা ধরণের দেখিলাম। পুরুষেরা একখানি কাল কম্বলের দুই কিনারা গলার দুই দিকে গের দিয়া কোটের আকার করিয়া পরে। কেদারখণ্ডে শিব ইহাকে ভীলের বেশ বলিয়াছেন *। তাই মনে হয় যে এখান হইতে ভীলকেদার তক পার্বত্যভূমিই ভীল্ল-ক্ষেত্র।

জঙ্গল চটি—ভীলগড়—মেলচৌরি—চকোরি।

১৮ মাইল (২৮শে মে)

ভোরে জঙ্গল চটি হইতে বাহির হইয়া মাইল দেড়েক চলিয়া দেউলখাল ঘাটিতে, আদিবদরীতে আরব্ধ ছয় মাইলের চড়াই শেষ করিয়া রামগঙ্গার অধিত্যকায় পড়িলাম। ঘাটির উপরে পুরাতন দুর্গ জুনিয়াগড়ের ধ্বংশাবশেষ আছে। আধ মাইল পর গণ্ডাবাজ, তার এক মাইল পর কালীমাটি। এখানে চা খাইলাম—তার পৌনে মাইল পর

* "Here I still engage in sport with the Bhils, clad in a dark-coloured blanket I wander about the hills at midnight." (*The Himalayan Districts*, II, p. 328).

রসিয়াগাড়, তার দেড় মাইল পর এক নালার উপর গোয়াড়ুগদনা, তার পৌনে মাইল পর (অর্থাৎ দেউলখালের সাড়ে চার মাইল পর) গরসৈন বা লোভা পাইলাম।

রামগঙ্গার এই অধিত্যকা-ভূমি গড়বাল রাজ্যের এক উৎকৃষ্ট অংশ বলিয়া প্রায়ই কুমাওন-রাজাদের দ্বারা আক্রান্ত হইত। এখনও এখানে কাছে কাছে বসতি ও চারিদিকে চাষ আবাদ দেখা গেল। ১৯১৪ সালের ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় লোভা সিপাহী সংগ্রহের এক কেন্দ্র ছিল, যাহার স্মৃতিস্তম্ভ এবং সিপাহীদিগের বাসগৃহগুলি এখনও দাঁড়াইয়া আছে। লোভাতে ডাকবাঙ্গলা এবং কয়েকটি দোকান আছে। এখান হইতে যোষিমঠে যাইবার এক সোজা পার্বত্য পথ আছে।

লোভাতে জলযোগ করিয়া চলিলাম। এক মাইল পর রামগঙ্গার তীরে ধুনারঘাট চটি, তার আধ মাইল আগে অপর তীরে এক শিবমন্দির। তার আধ মাইল পর ভীলগড় চটিতে পৌছিয়া তথায় দুপুরের মোকাম করিলাম। এই চটিতে এক সুন্দর ঝরণা বহিতেছে।

বিকালে বাহির হইয়া তিন মাইল চলিয়া রামগঙ্গার তীরে পড়িলাম ও আধ মাইল টেক চলিয়া উহা পার হইয়া (লোভা হইতে সাড়ে ছয় মাইল দূর) মেলচৌরি পাইলাম। চটিটি পাহাড়ের পাদদেশে রামগঙ্গার তীরে সঙ্কীর্ণ স্থানে অবস্থিত এবং খুব গরম। এখান হইতে কর্ণপ্রয়াগ ২৯ মাইল, রাণীখেত ৩১ মাইল। গড়বাল সীমান্ত বলিয়া পূর্বে এখানে কুলী বদল করিতে হইত। আমাদের অবশ্য তাহা করিতে হইল না। এখান হইতে এক মাইল কঠিন চড়াই উঠিয়া পাহাড়ের মাথায় পন্যুয়াখালে গড়বাল ছাড়িয়া কুমাওনে পড়িলাম। দুই অঞ্চলের মধ্যে প্রাকৃতিক পার্থক্য—বিশেষতঃ কুমাওনে জলের অভাব—প্রথম হইতেই লক্ষিত হইল।

দেড় মাইল নামিয়া শিমূলখেত, তার দুই মাইল পর রিওড়া, তার এক মাইল পর রামপুর ও তার আধ মাইল পর চকোরি চটিতে পৌছিয়া রাত্রের মোকাম করিলাম। চটিতে জলের নল আছে। পাহাড়ের মধ্যে এক বিস্তীর্ণ ভূমিতে চটিটি অবস্থিত। রাত্রে মৃদু শীতল বাতাস বহিতে লাগিল ও চন্দ্রকিরণে চারিদিক ভাসিয়া গেল। কুমাওন-ভূমিতে আমাদের প্রথম রাত্রি আরামে কাটিল।

চকোরি—গনাই—চিত্রেশ্বর—দ্বারাহাট—চন্দ্রেশ্বর। ১৪ মাইল (২৯শে মে)

ভোরে রওনা হইয়া দেড় মাইল পর ভোলা ও তাহার মাইল দেড়েক পর গনাই বা চৌখুটিয়া পাইলাম। ইহা মেলচৌরি হইতে নয় মাইল দক্ষিণে রামগঙ্গার উপরে অবস্থিত। গনাই-এর দুই মাইল দূরে কত্যুর রাজাদের এক শাখার রাজধানী লক্ষ্মণপুরের ধ্বংশাবশেষ আছে, যাহাকে এখন লোকে বিরাট রাজার রাজধানী বলে। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের সময় গনাই সিপাহী সংগ্রহের কেন্দ্র ছিল, যাহার স্মারক-লিপি রামগঙ্গার পুলের দক্ষিণে গ্রথিত আছে। গনাই হইতে রাণীখেত ২২ মাইল।

গনাইয়ে কয়েকটি দোকান আছে। এখান হইতে এক পথ উত্তর-পশ্চিমে পৌড়ীতে গিয়াছে। আমাদের পথ রামগঙ্গা পার হইয়া দুই শাখা হইল। একটি রামগঙ্গার ধার দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে রামনগর ষ্টেশনে গিয়াছে। এই পথে মাসি ও ভিখিয়া হইয়া শ্রীকোটে (২১ মাইল) গরুর গাড়ীর পথে পড়িয়া গুজরঘাটিতে রাণীখেতের শড়ক ধরিয়া কুমরিয়া ও দিখুলী হইয়া রামনগরে (৬৬ মাইল) গিয়া রেল ধরা যায়। এ পথ কষ্টকর, কিন্তু খরচে সুবিধা হয় বলিয়া কতক যাত্রী এই পথে ফেরেন। অপর শাখা দ্বারাহাট হইতে আগত কোথলার নামে উপনদীর ধার দিয়া দক্ষিণে রাণীখেতের দিকে গিয়াছে।

গনাই হইতে চলিয়া দুই মাইল পর গোয়ালি চটি, তার দুই মাইল পর কোথলার পার হইয়া বসতির মধ্যে মহাকালেশ্বরের মন্দির, ও তার দুই মাইল পর জোনপুরা গ্রাম পাইলাম। এখানে একটি ট্যানারি ও পানিচাক্কি আছে। ইহার আধ মাইল আগে চিত্রেশ্বরের মন্দির সংলগ্ন গ্রামে দুপুরে থাকিলাম; এখানে জলের বড় কষ্ট। স্কুলঘরের পূবে একটা পার্বত্য নালার পারে জলের ক্ষুদ্র নেওলা।

বিকালে বাহির হইয়া মাইল দেড়েক পর ডাকবাঙ্গালায় উঠিবার পথ, তাহার আধ মাইল পর কালেশ্বরের মন্দিরের নিকট ক্ষীণ কোথলার পার হইয়া সওয়া মাইল চড়াই উঠিয়া (গনাই হইতে দশ মাইল দূর) দ্বারাহাটে পৌঁছিলাম। ইহার উচ্চতা ৫০৩০ ফুট।

দ্বারা এ অঞ্চলের এক প্রধান স্থান। ইহা হইতে পশ্চিমে মাসি, পূবে সোমেশ্বর ও দক্ষিণ-পূবে অল্মোড়া (৩১ মাইল) যাইবার সোজা পথ আছে। এখানে ডাকবাঙ্গলা, কয়েকটি সরকারী অফিস, এবং বহুদিনের এক খৃষ্টীয় মিশন ও তাহার পরিচালিত স্কুল ও হাসপাতাল আছে। দ্বারার বাজার বেশ বড়। তাহাতে জর্মান উলের সুতা দিয়া চাদর বুনা হইতেছে। এক এক খানির দাম চার পাঁচ টাকা।

দ্বারা কত্যুরদের পালি শাখার এক কেন্দ্র হয়ত বা রাজধানীই ছিল। তাহাদের নির্মিত বৃহৎ মন্দিরের গুচ্ছরাজি সহরের চারিদিকে দেখা যায়।* সন্ধ্যা হইয়াছিল বলিয়া পথের ধারে মৃত্যুঞ্জয়-মন্দির-সমষ্টি মাত্র

* Dwarahat in former days was the residence of one branch of the Katyuri Rajas. The remains of very many ancient temples lie scattered about in groups. They altogether number thirty, but (having been desecrated by the Ruhilas) with the exception of those dedicated to Badri, Kedar, Sitala (on the Syalde tank), Kot-Kangra Devi (of the Chaudhuris of Dwara) and Kalika

আমরা দেখিলাম। একটিতে মাত্র এক বৃহৎ শিবলিঙ্গ (বোধ হয় রুহিলারা নষ্ট করার পর) স্থাপিত আছে, অন্য মন্দিরগুলি শূন্য। শিবলিঙ্গের পশ্চাতে হরগৌরী প্রভৃতি পূর্বের প্রস্তর মূর্তি সকল রাখা আছে।

দ্বারার নীচেই এক নালা পার হইয়া আধ মাইল গেলে অল্মোড়ার সোজা পথ বাহির হইয়া গেল। তাহার আধ মাইল পর এক ছোট নদী পার হইয়া চন্দ্রেশ্বর মন্দিরের কাছের চটিতে রাত্রের মোকাম করিলাম। চটির নীচেই একটা নদী। পানীয় জলের নেওলা কিছু দূরে।

Devi (below the Tharp) few are used for religious purposes. A portion of an inscription has been carried from Dwara to Dunagiri, bearing the date 1105 Saka, and this may be taken generally as the date of the erection of the principal temples in Dwara.

All the temples are of plain construction with the exception of one near Syalde Pokhar which (now in ruins) is elaborately carved with rows of figures representing gods, men, elephants etc. To the north-east is Dunagiri; to the north Nagarjun; to the east an eminence called Chandragiri (Chanchari); to the south Dharmagram; and to the west Bungaram. The palace of the Katyuri Rajas was built on the rock called Tharp on the Chandragiri hill.

The principal temple (which is under the Rawal of Badrinath in Garhwal) is dedicated to Badrinath. It is about 50 feet high. The old image was desecrated by the Ruhilas, and the new one is of modern make and is surrounded by ten or twelve others, one of which bears the date 1105 Saka and on another representing Ganesa is the date 1103 Saka. The image of Laksmi is in a small temple to the north. (*The Himalayan Districts*, III, pp. 221—3)

গনাই-এর পর পথের ধারে গ্রামে গ্রামে চন্দ্র রাজাদের আমলের যে সব শিবালয় দেখা যায় তাহার মধ্যে চন্দ্রেশ্বর একটি প্রধান। মন্দিরটি সাদাসিদে সুন্দর গঠন। এক চতুষ্কোন বেদীর উপর হইতে থাকে থাকে সরু হইয়া উঠিয়াছে। শিখর ছোট্ট চালে ঢাকা। প্রাঙ্গনে অসংখ্য ছোট ছোট মন্দির ও গৌরীপাটের উপর শিবলিঙ্গ আছে, আর নদীতে নামিবার প্রশস্ত বাঁধান ঘাট আছে। এখন সকলেরই (হয়ত রুহিলাদের কৃত) ভগ্ন দশা। আরতির সময় মন্দিরের মধ্যে গেলাম। চন্দ্রেশ্বর তামার পাতায় মোড়া গৌরীপাটের উপর স্থাপিত প্রস্তর লিঙ্গ।

কুমাওন

কুমাওনের যে অংশ আমরা দেখি তাহার কথা কিছু বলিতেছি। ইহা প্রায় ৩০০০ হইতে ৫০০০ ফুট উচ্চ শুষ্ক পার্বত্য দেশ। পর্বতের মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত উর্বর সমতল ভূমি। তার মধ্যে—গ্রীষ্মকালে শুষ্ক-প্রায়—নদীর খাত। নদীর অনেক উপরে গ্রাম সকল অবস্থিত এবং দুই একটি নেওলা বা ঢাকা কুণ্ড ছাড়া জলহীন। এ সময় আকাশ ঝাপসা, শুনিলাম বর্ষার পর উহা পরিষ্কার হয়, তখন কুমাওনের উচ্চ স্থান হইতে নন্দাদেবী প্রভৃতি উত্তরের তুষার-শৃঙ্গ সকল সুন্দর দেখা যায়। অনেক গ্রামে আম, জাম প্রভৃতি ফলের গাছ ও উচ্চ ভূমিতে খোপানীর বাগান আছে। রাণীখেতের বাজারে খোপানীর খুব আমদানি দেখিলাম। উঁচু পাহাড়ে চির গাছের বন আছে, যাহা হইতে চিরফোলিন বা গন্ধপিরোজা ধরা হয়। উহা হইতে বেরেলীর সরকারী কারখানায় তারপিন তৈল বাহির করা হয়।

কুমাওনে গ্রামের ঘরবাড়ীগুলি সুগঠিত, বিশেষতঃ উহাদের খোদাই করা চৌকাট নজরে পড়ে। পথে অনেক দরজার মাথায় মকরবাহিনী গঙ্গা অথবা পদ্মের চিত্র লাগান দেখিয়া খোঁজ করায় জানিলাম যে দুই দিন পূর্বে দশহরা বা গঙ্গাপূজা (জ্যেষ্ঠের শুক্লাদশমী) দিনে—বজ্রপাত-নিবারণ কল্পে—উহা লাগান হয়। অল্মোড়ায় আমরা এই চিত্র সংগ্রহ করি। উহাতে চক্র ঘিরিয়া লেখা আছে ঃ শ্রীগণেশায় নমঃ। অগস্ত্যশ্চ পুলস্ত্যশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ জৈমিনিশ্চ সমন্তশ্চ পঞ্চৈতে বজ্রবারকাঃ। ১। মুনেঃ কল্যাণমিত্রস্য জৈমিনেশ্চানুকীর্তনাং বিদ্যুদগ্নিভয়ং নাস্তি লিখিতে চ গ্রহোদরে। ২। যত্রানুযায়ী ভগবান হৃদ্যাস্তে হরবীশ্বরঃ ভঙ্গো-ভবতি বজ্রস্য তত্র শূলস্য কা কথা। ৩। শ্রীদশপাপহরায়ৈ গঙ্গাদেব্যৈ নমঃ। বাঙ্গলাদেশে এক মাত্র জৈমিনির নাম বজ্রবারক রূপে ব্যবহৃত হয়।

কুমাওনে দ্বারাহাট, বৈজনাথ প্রভৃতি স্থানে কত্যুরদের সময়ের অর্থাৎ একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যের বড় বড় মন্দির আছে। তাহা ছাড়া গ্রামে গ্রামে যে সকল শিব-মন্দির দেখা যায় তাহা পরবর্তী কালের চন্দ্ররাজাদের আমলের। এই রাজাদের কথা পরিশিষ্টে বলা হইবে।

কুমাওনে ঘোড়ার খুব প্রচলন। বদরী-যাত্রীদের চড়ার জন্য ও কাঠগুদাম হইতে মাল বহার জন্য ঘোড়া সরবরাহ হয়। কুমাওনে লোকদের পরিচ্ছদ নেপালীদের মত। কেহ সরু পাজামা পরে, কেহ বা ধুতি। স্ত্রীলোকেরা শাড়ী পরে। এদিকে উলি কাপড় বুনা হয়।

চন্দ্রেশ্বর চটি হইতে রাণীখেত। ১১ মাইল

(৩০শে মে)

আমরা ভোরে বাহির হইলাম। আজ রাণীখেতে পৌছিয়া আমাদের ডাণ্ডিতে চলা শেষ হইবে। দেড় মাইল চলিয়া আলিমরি ও তাহার আধ মাইল পর কফড়া গ্রাম পাইলাম। এখান হইতে নয় মাইল

দূরের পাহাড়ের মাথায় রাণীখেত ছাউনির ঘরবাড়ীগুলি ঝাপসা মত দেখা যাইতে লাগিল। আধ মাইল পর এক পিয়াও ও ছোট দোকানের কাছে চড়াই শেষ হইয়া উতার আরম্ভ হইল। এক মাইল পর উনাস গ্রাম —এখানে একটা বড় শিব-মন্দির আছে—তার দুই মাইল পর দরযাল গ্রাম, ও তার আধ মাইল পর গনাস নদীর তীরের চটিতে পৌছিলাম। এখানে নানা জিনিসের দোকান ও একটি শিব-মন্দির আছে।

এই চটিতে জলযোগ করিয়া এবং প্রশস্ত গভীর কিন্তু তখন শুষ্কপ্রায় গনাস নদী পুলে পার হইয়া রাণীখেত পযন্ত সাড়ে পাঁচ মাইলের চড়াই ধরিলাম। দুই মাইল উঠিয়া কোটলি চটি—এখানে জলের ভাল ব্যবস্থা —তার দেড় মাইল পর কিলকোট চটি পাইলাম। সেখানে অত্যন্ত জলকষ্ট ও অন্য অসুবিধা দেখিয়া আরও দুই মাইল উঠিয়া বেলা দশটায় একেবারে রাণীখেতে পৌছা গেল। রাণীখেতের কাছে দেখিলাম চির গাছে ক্ষত করিয়া তাহার নীচে গেলাসের আকারের ভাঁড় বাঁধিয়া চিরফোলিন ধরা হইতেছে। রাণীখেতে আমরা বাজারের নিকটে শিবালয়ের সংলগ্ন ধর্মশালায় উঠিলাম। এইখানে আমাদের যাত্রী-পথে চলা শেষ হইল। রাণীখেত হইতে কাঠগুদাম বাসে ৫২ মাইল।

ধর্মশালায় উঠিয়া প্রথমতঃ ডাণ্ডিবাহকদিগকে ও মালবাহক গিরিধারীকে বিদায় করা হইল। তাহাদিগের প্রাপ্য পারিশ্রমিক মিটাইয়া দিয়া ঋষিকেশে প্রদত্ত চিঠি দুই প্রস্ত ফাড়িয়া ফেলা হইল এবং আমাদিগের এই দীর্ঘ ও কঠিন তীর্থ-যাত্রা আরামে ও নির্বিঘ্নে সমাধা করানর পারিতোষিক স্বরূপ তাহাদিগকে পেট ভরিয়া পুরি ও জিলেবী খাওয়াইয়া এক একখানি ধুতি দেওয়া হইল। আমাদের ব্যবহৃত ডাণ্ডি দুইখানিও উহাদিগকে বকশিশ্ করা হইল। উহারা বিদায় হইলে আমরা স্নানাহার করিলাম।

রাণীখেত ছাউনি প্রায় ৬০০০ ফুট উচ্চ, কিন্তু শুষ্ক ও ছায়াহীন বলিয়া এ সময় বেশ গরম। সহরে জল কষ্ট; ছাউনির জন্ত জলের কল আছে বটে, কিন্তু তাহাতে সকালে ও বিকালে অল্পক্ষণ মাত্র জল পাওয়া যায়। আমরা যে শিবালয়ে উঠিয়াছিলাম সারা সহরে সেখানেই নাকি একটি মাত্র কূপ।

পাহাড়ের মাথায় ছাউনি ও ডাকবাঙ্গলা প্রভৃতি সরকারী বাড়ী। তাহার নীচে বাজার ও সাধারণ বসতি। বৃটিশ সৈন্তের ছাউনি হাওয়ায় রাণীখেতের পথ বাজার বেশ ভাল। এখানে সব রকম জিনিস মেলে। স্থানীয় হাতে বোনা নানা প্রকার উনি চাদর পাওয়া যায়। কাছে তারিখেত নামক স্থানে নাকি উনি গালিচা প্রস্তুত হয়। সময়াভাবে তাহা আমরা দেখি নাই। রাণীখেতে সবজি ও ফলের একটি মার্কেট আছে। বাজারের উপর হিন্দু ভদ্রলোকদের উপযোগী কয়েকটি ভাল হোটেল আছে। ধর্মশালা একটি, আমরা যেখানে নামি।

দেশে প্রত্যাবর্তন

আজকাল রাণীখেত রুহিলখণ্ড হইতে হিমালয় এবং তিব্বত অঞ্চলে যাতায়াতের প্রধান দ্বার। এখান হইতে পূবদিকে অল্মোড়া ও গরুড়, আর দক্ষিণ দিকে নৈনীতাল ও কাঠগুদাম প্রভৃতি স্থানে মোটর বাস্ চলাচল্ করিতেছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে রামনগরে যাতায়াতের উৎকৃষ্ট সড়ক আছে। আমরা বাসের সুবিধা লইয়া এই অঞ্চলের কয়েকটি স্থান দেখিয়া—যাহার কথা পরে দেওয়া হইল—৬ই জুন প্রায় দ্বিপ্রহরে কাঠগুদামের চারি মাইল দক্ষিণে হলদোয়ানি ষ্টেশনে পৌছি। সেখানে স্নানাহার করিয়া ট্রেণ ধরিয়া বেরেলি জংসনে গিয়া পরদিন ভোর চারিটায় দেরাদুন এক্সপ্রেস ধরিয়া ৮ই জুন (২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ) সকালে কলিকাতায় ফিরি।

কুমাওনে সাত দিন

রাণীখেত হইতে অল্মোড়া। ২৯ মাইল

(৩১শে মে)

রাণীখেতে হোটেলে খাওয়া দাওয়া করিয়া প্রায় দুপুর বেলা মেল বাসে রওনা হইয়া বেলা তিনটায় অল্মোড়া পৌছিলাম। প্রত্যেকের বাস্ ভাড়া ১॥০ টাকা ও অল্মোড়ার মিউনিসিপাল টেক্স ॥০ আনা লাগিল। অষ্টম মাইলে মাজখালিতে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া বাস্ ডাক লইল। এখানে বড় বসতি ও কয়েকটি দোকান আছে, এবং নিকটে (নিয়াজ) পোল্ট্রি-ফার্ম ও রুণি গ্রামে বন বিভাগের অফিস। মাইল ২২-এ, কাটারমলের নিকট গরুড়ের শড়ক উত্তরে নামিয়া গেল। তার মাইল দুই পর পাকা পুলে কুশী পার হইয়া কয়েক মাইল চলিয়া নাকাতে টেক্স দিয়া আমরা অল্মোড়া সহরে পৌছিলাম। সড়কের ধারে কয়েকটি হোটেল আছে এবং উপরে বাজারের পিছনে নরসিংহের মন্দিরের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র ধর্মশালা আছে। জলকষ্ট-হেতু অল্মোড়ায় হোটেলে নামাই সুবিধা। আমরা ইম্পিরিয়াল হোটেলের দোতালার স্নানাগার ও পায়খানা-সহ একটি কামরা লইয়া থাকিলাম। খাবার ব্যবস্থা কতক স্বপাকে কতক হোটেলে হইল।

বিকালে বাহির হইয়া সহরের দক্ষিণ ভাগে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং উপরে বাজার দেখিয়া আসিলাম।

অল্মোড়া সহর

(১লা জুন)

এ দিন আমরা সহরটি ঘুরিয়া দেখিলাম। কুশী ও সুয়াল নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী ৫৩০০ ফুট উচ্চে স্থিত পর্বতের উপর অল্মোড়া সহর। মানস-খণ্ডে এই পর্বতের উল্লেখ আছে। অল্মোড়া হইতে চারিদিকে পথ।

তার মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য— বেরীনাগ, আস্কোট ও ধারচুলা হইয়া মানসরোবর ও কৈলাসের ২০০ মাইল পথ, যাহার কথা পরে বলা হইবে, আর দক্ষিণ দিকে পুড়া, রামগড় ও ভীমতাল হইয়া কাঠগুদামের ৩৮ মাইল পার্বত্য পথ। এই পথের কিছু পূবে ৭৫০০ ফুট উচ্চে মুক্তেশ্বরের মন্দির ও গভর্ণমেণ্টের ব্যাকটেরিয়াল লেবরেটরি।

অল্মোড়ায় পূর্বে কত্যুরদের খাগমারা নামে দুর্গ ছিল। আনুমানিক ১৫০০ সালে চম্পাবতের রাজা কীর্তিচন্দ্র ইহা দখল করেন, ও ১৫৬০ সালে তাঁহার বংশধর রাজা বাল কল্যাণচন্দ্র চম্পাবৎ হইতে রাজধানী এখানে উঠাইয়া আনেন। তদবধি অল্মোড়া কুমাওনের প্রধান সহর রহিয়াছে। চন্দ্ররাজারা প্রথমতঃ খাগমারা কোটে বাস করিতেন, পরে উপরে উঠিয়া গিয়া মল্লা-মহল নির্মাণ করেন, যেখানে এখন সরকারী অফিস সমূহ অবস্থিত।

গ্রীষ্মের সময় অল্মোড়ায় বড় জলকষ্ট। জলের প্রধান সম্বল মিউনিসিপাল অফিসের নিকট রাস্তার নীচে এক প্রাচীন নেওলা বা ঢাকা জলকুণ্ড।

অল্মোড়া সহরে একমাত্র গাড়ীর সড়ক পাহড়ের পাদদেশ দিয়া গিয়াছে। ইহার ধারে পুরাতন বসতি এবং এখানকার মিউনিসিপাল অফিস, ডাকবাঙ্গলা, মোটর ষ্ট্যাণ্ড, ডাকঘর, হোটেল সমূহ ও কয়েকটি দোকান। বাকি সহর ও প্রধান বাজার পাহাড়ের মাথায়। বাজারের মধ্য দিয়া উত্তর দক্ষিণে এক মাইলের উপর লম্বা পাথরে বাঁধান পথ, তাহার দুধারে নানা জিনিসের দোকান। বাজারের উত্তর মাথায় চন্দ্ররাজাদের নির্মিত মল্লা-মহলের ধ্বংসাবশেষ, দক্ষিণ মাথায় গুরখা সিপাহীদের লাইন।

আমরা মিউনিসিপাল অফিসের কাছে গাড়ীর সড়ক হইতে উঠিয়া প্রথম মল্লা-মহলে গেলাম। এখানে পুরাতনের মধ্যে আছে চারিদিকের

প্রাচীর ও রামচন্দ্রের চরণ-মন্দির, যাহা বোধ হয় গড়বাল রাজবংশীয় প্রদ্যুম্নের রাজত্বকালের (১৭৭৯—১৭৮৬)। এই কেল্লা হইতে বহু দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে, কিন্তু এ সময় সব ঝাপসা দেখা গেল। বাজারের মাঝামাঝি একটি সরু গলি নরসিংহ-মন্দিরের দিকে নামিয়া গিয়াছে। ইহার কিছু দক্ষিণে বাজারের মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে মুরলীমনোহরের মন্দির। বাজারের দক্ষিণ মাথায় গুরখা লাইন। তথা হইতে পথ নামিয়া গাড়ীর সড়কে মিশিয়াছে।

মিউনিসিপাল অফিসের নিকট (থাগমারায়) কুমাওনের শেষ স্বাধীন রাজা মহেন্দ্রসিংহের বংশধর বাস করিতেন। তাঁহার অল্মোড়ার রাজা উপাধি ছিল ও সহরের অনেক জমির তিনি মালিক ছিলেন। অল্পদিন আগে ৬২ বৎসর বয়সে তিনি মারা গিয়াছেন। তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা অল্প-বয়সে মারা যান বলিয়া নাকি তিনি বিবাহ করেন না। তাঁহার অভাবে এই বংশের অন্য শাখার কাশীপুরের নাবালক রাজা বংশের একমাত্র প্রতিনিধি থাকিলেন।

ইহার অল্প দূরে বসতির মধ্যে নন্দাদেবীর মন্দির। আনুমানিক ১৬৭০ সালে রাজা বাজ-বাহাদুর লোভা অঞ্চলের দেউলখালের উপরস্থ জুনিয়াগড় দখল করিয়া তথা হইতে এই মূর্তি লইয়া আসেন।* নন্দা-স্থানে নাকি ছাগাদি বলি হয়। বর্তমানে নিরামিষাশীদের বাহুল্যে এই শাক্ত দেবীস্থান চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সময়ে না জানাতে আমরাও ইহা দেখি নাই।

---

* "He carried away with him the image of the goddess Nanda which he established in the temple in the old fort of Almora, and which was subsequently removed to its present site by Mr. Traill". (*The Himalayan Districts*, II, p. 566).

গাড়ীর শড়কের ধারে গভর্ণমেণ্ট-চালিত বস্ত্রবয়নের স্কুল এবং স্থূতি ও উনি কাপড়ের দোকান। তাহাতে তিব্বতীয় কম্বল ও পংখী বা পট্টু এবং কুমাওনের পাতলা উনি চাদর ও নানা স্থানের হাতে বোনা শাড়ী প্রভৃতি বিক্রয় হয়। ইহার দক্ষিণে, ডাকঘর ছাড়াইয়া আর্যসমাজের ঘর ও বিদ্যালয়, তারপর কৌন্সিল অফ এগরিকালচারাল রিসার্চের অধীনে শ্রীযুক্ত বশী সেন পরিচালিত লেবরেটরি।

তাহার আধ মাইল দক্ষিণে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম। এই মিশনের আর একটি আশ্রম অল্মোড়া সহরের ৯৫ মাইল পূবে কৈলাসের পথের উপর ধারচুলার নিকট অবস্থিত। আর তৃতীয় একটি আশ্রম—স্বামী বিবেকানন্দ স্থাপিত মায়াবতী অদ্বৈত-আশ্রম, যেখান হইতে প্রবুদ্ধভারত পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়—অল্মোড়ার দক্ষিণ-পূবে কালী কুমাওনে।* এখন প্রবুদ্ধভারত আশ্রমের কলিকাতা অফিস, ৪ ওয়েলিংটন লেন হইতে প্রকাশিত হয়।

অল্মোড়া সহরে আর একটি প্রতিষ্ঠান দেখিলাম, কৈলাস মানসরোবর যাত্রা কমিটি। মিউনিসিপাল অফিসের কাছে ইহার অফিস ও যাত্রীনিবাস। সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া ডাণ্ডি, কুলী, প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া যাত্রীরা দলবদ্ধ হইয়া যাত্রা আরম্ভ করিতে পারেন। উক্ত নন্দাদেবী প্রভৃতি শিখরে আরোহণ-অভিযান এবং মিলম্ তুষার-অভিযান যাত্রারও অল্মোড়া কেন্দ্র। এই দুই পথের কথা এবং অল্মোড়ার নিকটের বাগেশ্বর ও জাগেশ্বর দুইটি বড় তীর্থের কথা পরে বলা হইল।

* "The Asram is situated in one of the most picturesque spots of the Himalaya, at a height of 6800 feet above sea-level. It is 37 miles north of Tanakpur, on the R. K. Railway, and nearly 50 miles east of Almora, with both of which places it is connected by a bridlepath with rest-houses at convenient distances".

সম্প্রতি অল্মোড়া সহরের নিকটে বাঙ্গালীর আর একটি উদ্যোগ হইয়াছে—উদয়শঙ্করের নাট্যশালা। এর জন্য "যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট শিমতলা বনে ২৪ একর জমি দিয়াছেন। তাহার কাছে বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছে এবং একটি বড় ষ্টুডিও নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।"

মানসরোবর ও কৈলাস যাত্রা

মানসখণ্ডে ব্রহ্মদেব বা টনকপুর হইয়া কূর্ম্মাচল-পথে কৈলাস যাত্রার নির্দেশ আছে। তখন হয়ত ঐ পথই চলিত ছিল। কুমাওনের চন্দ্ররাজগণ এই পথে দৃষ্টি দিতেন। আন্দাজ ১৬৭০ সালে রাজা বাজ বাহাদুর এই পথের বিঘ্নকারী হূনীয়দিগকে দমন করেন এবং যাত্রীদের সাহায্যার্থ ভূমি দান করেন। আজকাল অল্মোড়া হইতে এই যাত্রা আরম্ভ হয়। ইহার বিবরণ শ্রীযুক্ত স্থশীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'মানস-সরোবর ও কৈলাস' পুস্তকে আছে। অল্মোড়া হইতে কৈলাস পর্বত প্রায় ২০০ মাইল পথ। কুমাওনের বিখ্যাত অঞ্চল ও কয়েকটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানের মধ্য দিয়া ইহা গিয়াছে—অল্মোড়ার ৪৫ মাইল পূবে চা আবাদের কেন্দ্র বেরীনাগ, তার মাইল দশ পর রামগঙ্গা নদীর তীরে প্রাচীন বালেশ্বর মন্দির, তার ১৮ মাইল পর কত্যুর রাজবংশীয় রাজওয়ারা সাহেবের নিবাস আস্কোট, তার ২২ মাইল পর ধারচুলা—যাহার নিকটে রামকৃষ্ণ মিশনের এক আশ্রম আছে—তার ৫০ মাইল পর গর্বিয়া এ (১০৩২০ ফুট) বৃটিশ সীমান্ত পার হইয়া ও ২০ মাইল পর ল[illegible]খ ঘাটিতে (১৬৫০০ ফুট) তিব্বত এলাকায় পড়িয়া ৭ মাইল পর তকলাকোট সহর, ও তার ২৭ মাইল পর মানসরোবরের দক্ষিণ তীরে গুরলা ঘাটি।

যাত্রা কমিটি এই পথে ধর্ম্মশালা ও সদাব্রত স্থাপনের কল্পনা করেন। তাহার কিছুই হয় নাই। তথাপি অল্মোড়ার যাত্রীনিবাসটি যদি স্থায়ী হয় তাহাতে বিশেষ উপকার হইবে।

মিলম্‌ তুষার-রাজ্য

অল্মোড়ার উত্তরে নন্দাদেবী প্রভৃতি হিমালয়শৃঙ্গে আরোহণ করার জন্য পোল ও জ্যাপ অভিযান অল্মোড়া হইতে গিয়া নন্দাদেবীর পূর্বে মিলম্‌ উপত্যকায় কেন্দ্র স্থাপন করেন। অল্মোড়া হইতে মিলম্‌ ১২০ মাইল, যাইতে দশ এগার দিন লাগে। পথে এই সকল স্থান পড়ে—বাঘেশ্বর তীর্থ (৩৩০০ ফুট), কফকোট, শামাখুরা (৮৬০০ ফুট) তেজম্‌, মনসারি, নহর (৮৬০০ ফুট) মারতোলি (১১১০০ ফুট, একবারের অভিযান-কেন্দ্র) ও মিলম্‌ (১১২০০ ফুট)। একজন পর্যটক লিখিয়াছেন যে পথ দুর্গম ও কষ্টসাধ্য, কিন্তু ইহাতে স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ মিলমে, তুষার রাজ্যের যে দৃশ্য পাওয়া যায় তাহাতে সকল কষ্ট সার্থক বোধ হয়।

বাঘেশ্বর

এই তীর্থ অল্মোড়ার ২৭ মাইল উত্তরে প্রাচীন কত্যুর উপত্যকায় গোমতী ও সরযূ নদীদ্বয়ের সঙ্গমে অবস্থিত। এখানের বর্তমান মন্দির আনুমানিক ১৪৫০ সালে রাজা লক্ষ্মীচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত, কিন্তু তাহাতে রক্ষিত প্রস্তরলিপি হইতে জানা যায় যে আদি মন্দির তাহার প্রায় পাঁচশত বর্ষ পূর্বে কত্যুরবংশীয় রাজাদের আমলে নির্মিত হয়। মানসখণ্ডে বাঘেশ্বরের উল্লেখ আছে। এখনও বাঘেশ্বর এ অঞ্চলের এক প্রধান স্থান। এখান হইতে গরুড় ও সোমেশ্বরে যাইবার সোজা পথ আছে। অল্মোড়া হইতে বাঘেশ্বর আসিবার প্রায় মধ্যপথে পূর্বের দিকে ৮০০০ ফুট উচ্চ পর্বত শীর্ষে বীণেশ্বরের মন্দির—রাজা কল্যাণচন্দ্রের (১৭৩০-১৭৪৮) নির্মিত। এখানে প্রথমে তাঁহার এবং পরে রামজে সাহেবের গ্রীষ্মাবাস ছিল।

জাগেশ্বর

এই তীর্থ অল্মোড়ার ১৮ মাইল দক্ষিণ-পূবে চম্পাবত্তের পথে অবস্থিত। মানসখণ্ডে এ স্থানের নাম দারুকাবন বলা হইয়াছে। তদনুসারে জাগেশ্বর দ্বাদশ জোতির্লিঙ্গের অন্তর্গত "নাগেশং দারুকাবনে" এবং কুমাওনে সর্বশ্রেষ্ঠ বিগ্রহ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।* এখানে কত্যুর রাজাদের কোন কীর্তি নাই, কিন্তু রতনচন্দ্র (১৪৫০-১৪৮৮) হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্ররাজাদের অনেকের ভূমি-দান আছে। জাগেশ্বরের নিকটে ৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তির বিধবা শ্রীযুক্তা যশোদা মাই উত্তর-বৃন্দাবন নাম দিয়া এক আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, যেখানে মিষ্টর নিক্সন প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যেরা থাকেন।

অল্মোড়া হইতে গরুড়। ৪২ মাইল

(২রা জুন)

সকাল সাড়ে ছয়টায় অল্মোড়া হইতে রওনা হইয়া সাত মাইল চলিয়া বেলা সাতটার সময় কুশীর পুল পার হইয়া বাস্ বদল করিয়া গরুড়ের

---

* Amongst the Saiva foundations in Kumaon, that of Jageswar both from the extent of its endowment and the reputation for sanctity that it possesses is the most important. It is frequently mentioned in the *Manasa-Khanda* and keeps up a large establishment of *pandas* or priests to minister before its numerous idols. Here Mahadeva is worshipped under the form Jyotirling. The largest temples are those dedicated to Jageswar, Mritunjaya and Dandeswar. The great fairs are held on the Baisakh and Kartik purnamasis (15th May and 10th November). Bloody sacrifices only occur to Kshetrapal. A votive offering exists in the shape of an image in silver of a Paundra Raja holding a lamp in his hands. The Pandas are called Baroras, descendants of a Dakshini Bhat who married the daughter of a hill Brahman. (*The Himalayan Districts*, II. pp. 778-780)

পথ ধরিয়া এগারটায় তথায় পৌছিলাম। বাস্ ভাড়া ২৲ টাকা। পুলের কিছু উপরে কাটারমলে রাণীখেতের সড়ক ছাড়িয়া আমাদের বাস্ কুশী নদীর পশ্চিম তীরের সড়ক ধরিয়া উত্তর-মুখে উঠিতে লাগিল। মাইল দুই পর হালবাগ গুরখা ক্যাম্প, সেখান হইতে প্রায় ১৪ মাইল পর সোমেশ্বরের বাজারে ডাক লইবার জন্য অনেকক্ষণ বাস্ থামিল। সোমেশ্বর এ অঞ্চলের একটি প্রধান স্থান। এখান হইতে পশ্চিমে দ্বারাহাট, পূবে বাঘেশ্বর (১৪ মাইল) ও দক্ষিণে অল্মোড়া যাইবার সোজা পথ আছে। এখানে সোমেশ্বরের বড় মন্দির আছে, শিবরাত্রের সময় মেলা হয়। সোমেশ্বর হইতে আড়াই মাইল পর গরগেট গ্রাম, যেখানে গান্ধী-আশ্রমে উনি কাপড় বুনা হইতেছে। ইহার অল্প পরে কুশী নদী পার হইয়া উহার পূব তীর ধরিয়া মাইল পাঁচেক উঠিয়া কৌশানিতে পর্বতশীর্ষ পার হইয়া প্রায় দশ মাইল ক্রমাগত নামিয়া বেলা এগারটার সময় গরুড় গ্রামে পৌছিলাম। ইহার আগে মোটরের পথ নাই।

গরুড় প্রাচীন কত্যুর পরগণার প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত। এখান হইতে বৈজনাথের মন্দিরসমূহ মাত্র এক মাইল দূর। গরুড় হইতে এক পথ সোজা বাঘেশ্বরে গিয়াছে আর এক পথ ৪৭ মাইল উত্তরে নন্দপ্রয়াগে গিয়া বদরীর পথে মিলিয়াছে। ত্রিশূল, নন্দাদেবী প্রভৃতি হিমালয়-শৃঙ্গ আরোহণ-উদ্দেশে কেহ কেহ গরুড়ের দিক দিয়া অগ্রসর হন। আমাদের সামনেই "১৯৩৯ সালের সুইস্ ক্লাইম্বিং পার্টি"র চারি পাঁচজন ইউরোপীয়ন পঞ্চাশ দফা মোট ও একদল কুলীসহ বাসে গরুড়ে আসিয়া আগে চলিয়া গেলেন।

গরুড়ে ডাকঘর ও কয়েকটি দোকান ঘর আছে। এখানে উনি বস্ত্র বুনা হয়। আমরা এক দোকানের দোতালায় বাসা লইলাম। চটির কাছেই গরুড়গঙ্গা নামে ক্ষুদ্র নদী, তাহার তীরে পানীয় জলের নেওলা।

আমরা বিকালে বৈজনাথের মন্দির দেখিতে গেলাম। গরুড়ের নীচে গরুড়গঙ্গা ও বৈজনাথ গ্রামের আগে গোমতী নদী পুলে পার হইতে হইল। এই দুই নদী নীচে গিয়া এক হইয়া, বার মাইল নীচে বাগেশ্বরে সরযূ নদীর সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণ-পূব দিকে চলিয়া কালী বা সারদা নদীতে পড়িয়াছে। বৈজনাথে বা তাহার সন্নিকটে কত্যুরদের শাসনে উল্লিখিত প্রাচীন রাজধানী কার্তিকেয়পুর অবস্থিত ছিল। কার্তিকেয়পুর লোকমুখে কত্যুর হইয়াছে। বৈজনাথে অনেকগুলি সুন্দর প্রাচীন মন্দির ও মূর্তি এবং ইহার পশ্চিমে তল্লিহাটে দুইটি উচ্চ মন্দির ও কয়েকটি প্রাচীন মূর্তি এবং উত্তরে পর্বতশীর্ষে কত্যুরদের রণচুলা দুর্গের ভগ্নাবশেষের মধ্যে দেবীর স্থান বিদ্যমান আছে। এক সময় যে স্থানটি খুব সমৃদ্ধ ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়।

বৈজনাথের মন্দিরগুলির মধ্যে দুই চারিটি শূন্য পড়িয়া আছে। সম্ভবতঃ ইহা রুহিলা আক্রমণের ফল। একটিতে ক্ষুদ্র স্বাভাবিক প্রস্তর-শৃঙ্গ কেদার নামে পূজিত হইতেছে। বৈজনাথও ঐরূপ স্বাভাবিক প্রস্তর শৃঙ্গ, তামায় মোড়া গৌরীপাটের মধ্যস্থলে বিরাজিত। ইহার উপরে বৃহৎ মন্দির ছিল, এখন তাহার নীচের ফুট দশেক মাত্র খাড়া আছে উপরের সমস্ত—সম্ভবতঃ ভূকম্পে—নষ্ট হইয়াছে। ছাদের একখানা প্রকাণ্ড ফুলকাটা পাথর মন্দিরের পিছনে পড়িয়া আছে। মন্দিরের সামনের জগমোহনেরও ছাদ নাই। এই মন্দির বোধ হয় প্রাচীন কত্যুর রাজাদের নির্মিত, যাঁহাদের রাজ্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে রুদ্র-চন্দ্র জয় করিয়া লন। চন্দ্ররাজগণও ইহার জন্য দেবত্র দান করেন এবং রাজা জ্ঞানচন্দ্র (অষ্টাদশ শতাব্দীতে) ইহার সংস্কার করেন। বৈজনাথের পূজারী মথুরাগিরি গৃহস্থ শৈব যুবক। তাহার ঘরে ১॥ ফুট × ১ ফুট নেপালী ধরণের নাগরী অক্ষরের এক প্রস্তরলেখ দেখিলাম।

মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে বহু সুন্দর প্রাচীন মূর্তিসমূহ রাখা আছে—উৎকৃষ্ট মসৃণ পাথরের বৃহৎ চণ্ডী, বড় ও ছোট নৃত্যরত অষ্টভুজ গণেশ, মহিষমর্দিনী, হরপার্বতী, মাতৃকারাজি, শেষশায়ী বিষ্ণু, সূর্য, বরাহ অবতার প্রভৃতির মূর্তি। সম্মুখে কয়েকটি বৃষ ও সিংহমূর্তি আছে।

মন্দিরের ঘাটে গোমতী নদীর স্বল্প জলে এক ঝাঁক মহাশীর্ষ মৎস্য থাকে। আমরা হাঁটিয়া নদী পার হইয়া অপর তীরে হাসপাতালে উঠিলাম। তথায় এক বাঙ্গালী ডাক্তার থাকেন। জলের নলের ব্যবস্থার জন্য বাহিরে থাকায় তাঁহার সহিত আমাদের দেখা হইল না।

রণচুলা-কোটে দেবী ও তল্লিহাটে সত্যনারায়ণ দর্শন

(৩রা জুন)

ভোরে গরুড় হইতে বাহির হইয়া বৈজনাথে মথুরাগিরিকে সাথে লইয়া মাইল দুই চড়াই উঠিয়া পাহাড়ের মাথায়, উচ্চ তোরণের মধ্য দিয়া কত্যুরদের প্রাচীন দুর্গ রণচুলা কোটে উঠিলাম। কোটটি ছোট। চারিদিকের ভগ্ন প্রাচীর ও গোটা দুই লোহার কামানের খণ্ড ছাড়া এখন আর উহার কিছু নাই। একটি সাধারণ দালানে দেবীর স্থান, উহার সামনে অঙ্গনে পশুবলির স্থান। আশেপাশে ভোগ-পাকের জন্য ও যাত্রীদের বসিবার জন্য দুই তিনটি দালান। এখানকার পূজারী তেওয়ারি ব্রাহ্মণ। তল্লিহাট হইতে সকালে আসিয়া পূজা ও ভোগ দিয়া মন্দির বন্ধ করিয়া নামিয়া যায়। তারপর কোটে কেহ থাকে না।

আমরা যখন পৌঁছিলাম, তখন দেবীর স্নান হইতেছিল, তাই সব মূর্তি বেশ দেখা গেল। দেবী পাথরের উপবিষ্ট দ্বিভুজ স্ত্রী মূর্তি। তাঁহার পাশে রক্ষিত এক প্রস্তর মূর্তির পিঠ দেখা গেল, ইহাই পূজিত হয়। উহার মুখ উত্তরে নন্দাদেবীর দিকে করা আছে। আশে পাশে গণেশ ও অন্যান্য মূর্তির খণ্ড সকল রাখা আছে।

কোটের উত্তরের দ্বার দিয়া নামিয়া বৈজনাথ গ্রাম হইয়া তল্লিহাটে গেলাম। বসতির মধ্যে দুইটি উচ্চ ও সুন্দর পাথরের মন্দির শূন্য পড়িয়া আছে, দুইটিই গভর্ণমেণ্ট-রক্ষিত পুরাকীর্তি। দুইটিতেই পুরাতন মূর্তির খণ্ড সমূহ পড়িয়া আছে। বসতির বাহিরে গোমতী নদীর তীরে একটি সামান্য ভগ্ন মন্দিরে সত্যনারায়ণ নামে বৃহৎ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি পূজিত হইতেছে। ইহার অবস্থা অতি হীন। ইহার পূজারী মথুরাদাস নামে এক বৈরাগী গৃহস্থ যুবক। বৈজনাথ মন্দিরে আমরা যে উৎকৃষ্ট মসৃণ পাথরের চণ্ডীমূর্তি দেখিয়াছিলাম, এ বিষ্ণুমূর্তি সেইরূপ উৎকৃষ্ট। উহার উপরের ডান হাত হইতে নীচের ডান হাতে যথাক্রমে চক্র, গদা, শঙ্খ ও পদ্ম ধৃত। এ মূর্তির আশপাশে হরগৌরী, গণেশ প্রভৃতির মূর্তি রাখা আছে। এগুলি নাকি নিকটের বিদ্ধস্ত মৃত্যুঞ্জয়-মন্দির হইতে সংগৃহীত। উহার অনেক পাথর গোমতীর পুলে গিয়াছে।

আমরা গরুড়ে ফিরিয়া স্নানাহার করিয়া বিকাল তিনটায় ডাকের বাসে রাণীখেতের টিকেট করিয়া রওনা হইলাম এবং ৩৫ মাইল গিয়া কাটারমলের নিকট কুশী নদীর পুলের উপরের চটিতে রাত্রে থাকিলাম। গরুড় হইতে রাণীখেত ৫৭ মাইল দূর। বাস্ ভাড়া ২৲ টাকা।

কুশীনদী—রাণীখেত—নৈনীতাল। ৫৮ মাইল

(৪ঠা জুন)

সকাল সাতটায় অল্মোড়া হইতে বাস্ আসিলে আমরা তাহাতে উঠিয়া বেলা নয়টায় রাণীখেতে পৌছিলাম। শুনিলাম যে ঘণ্টাখানেক পরে ঐ বাস্ কাঠগুদাম অভিমুখে রওনা হইবে। রাণীখেতে আমাদের যে জিনিস রাখা ছিল তাহা লইয়া ও জলযোগ করিয়া আমরা ঐ বাসেই চলিলাম ও ৩৬ মাইল চলিয়া নৈনীতাল সহরের নীচে গেটিয়া নামক স্থানে একটার সময় নামিলাম। ভাড়া ১৷৹ টাকা করিয়া লাগিল।

রাণীখেতের (৬০০০ ফুট) উচ্চ ভূমি হইতে ক্রমাগত ১৮ মাইল নামিয়া খয়রণাতে (৩০০০ ফুট) কুশীনদী পার হইয়া দুই মাইল গিয়া রতিঘাট নামক স্থানে বাস্ অনেকক্ষণ থামিল। এখানে বেশ জল, ও কয়েকটি খাবারের দোকান। এখান হইতে পূবে রামগড় হইয়া মুক্তেশ্বর যাইবার পথ আছে। রতিঘাট হইতে চড়াই আরম্ভ হইল, এগার মাইল উঠিয়া এক মাইল ধরিয়া ভাউলী স্বাস্থ্যাবাস (৫০০০ ফুট) পার হইয়া রাণীখেত হইতে ৩৬ মাইলে গেটিয়া পৌছিলাম। ভাওলী হইতে ভীমতাল যাইবার শড়ক আছে।

গেটিয়াতে নামিয়া, জলযোগ করিয়া এবং মাল বহার জন্য একটি কুলী ঠিক করিয়া আমরা হাঁটিয়া নৈনীতাল পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। এক মাইল চড়াই ও মাইল দুই সমান পথ চলিয়া প্রায় চারিটায় সহরে পৌছিলাম ও তল্লিতাল অঞ্চলে ডাকঘরের নীচে কাঠগোলার কাছে নূতন ধর্মশালায় বাসা নিলাম। রাণীখেত হইতে বাসে বরাবর নৈনীতাল সহরে আসা যায়, কিন্তু তাহাতে পৌছিতে দেরী হয় আর প্রত্যেক আরোহীকে ১৲ টাকা করিয়া মিউনিসিপাল টেক্স দিতে হয়। আমরা বাসের এক ঘণ্টা আগে পৌছিলাম, আর কুলী ভাড়া ছয় আনা ও টেক্স ছয় পয়সা মাত্র লাগিল।

তল্লিতালে কয়েকটি দেশী হোটেল আছে, তাহার মধ্যে 'হিরোজ কাকি' নামে ডাকঘরের কাছের ছোট হোটেলটি ভাল বোধ হইল, কিন্তু তাহাতে থাকিবার স্থান বড় কম। বাজারে মেঠাই-এর দোকান ও ভাত রুটির শুদ্ধাচার ভোজনালয় আছে। ইহাদের সাহায্যে আ[illegible] নৈনীতালে দুই তিন দিন চালাই। নৈনীতাল ৬৩৫০ ফুট উচ্চ, কিন্তু পর্বতবেষ্টিত ও বৃক্ষহীন বলিয়া গ্রীষ্মকালে তেমন ঠাণ্ডা নয়। কুমাওনের অন্য স্থানের মত এখানেও আকাশ ধোঁয়াটে দেখিলাম।

নৈনীতাল সহর

(৫ই জুন)

এই দিন আমরা নৈনীতালে থাকিয়া সহর ঘুরিয়া দেখিলাম। হ্রদই নৈনীতালের বৈশিষ্ট্য। উহা উত্তর-দক্ষিণে প্রায় এক মাইল লম্বা, দক্ষিণে বাঁধের কাছে প্রায় পোয়া মাইল চওড়া। এখানে কোন সময় পাহাড় ধ্বসিয়া পড়িয়া এই হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে, পরে বাঁধ পাকা করিয়া অতিরিক্ত জল নিকাশের ব্যবস্থা হয়। বাঁধের মধ্যে ডাকঘরের পিছনে এক গন্ধকের জলের প্রস্রবণ আছে। হজমি বলিয়া এই জলের খুব আদর। হ্রদের দক্ষিণে তল্লিতাল বসতি। এখানে বাজার, জেলার দপ্তরসমূহ, ডাকঘর, মোটর বাস্ ষ্ট্যাণ্ড, দেশী হোটেল ও নূতন ধর্মশালা অবস্থিত।

হ্রদের উত্তর মাথায় নৈনী-দেবীর মন্দির, যাহা হইতে হ্রদ ও সহরের নাম হইয়াছে। মন্দিরের সংলগ্ন এক ধর্মশালা আছে। সেখানে ভাড়া দিয়া কয়েকদিন থাকা যায়। ইহার উত্তরে এক প্রকাণ্ড মাঠ, যাহাতে ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি খেলা হয়। ১৮৮০ সালে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি একটি জনপূর্ণ হোটেল ধ্বসিয়া পড়িয়া এই ময়দানের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ময়দানের উত্তরে মল্লিতাল অঞ্চল, যেখানে সহরের বড় বাজার, মিউনিসিপাল অফিস, যুক্তপ্রদেশ গভর্ণমেণ্টের সাময়িক দপ্তর প্রভৃতি অবস্থিত। ইহার উত্তরের গিরিশিখরের নাম চিনা পিক্।

হ্রদের দুই পাশেই উচ্চ পর্বতমালা। তাহাদের পাদদেশে হ্রদ ঘুরিয়া প্রায় তিন মাইল লম্বা সমতল পথ। হ্রদের তীরে কয়েকটি বোট-হাউস আছে, এবং হ্রদ-বিহারের জন্য বোট ভাড়া পাওয়া যায়। হ্রদের পূবে রাস্তার ধারে কয়েকটি হোটেল ও বিলাতী দোকান আছে, ও তাহার উপরে পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত বাড়ী, হাসপাতাল, স্কুল প্রভৃতি আছে। হ্রদের পশ্চিমদিকে হোটেল বা দোকান নাই, ওদিকে পাহাড়ে

গভর্ণমেণ্ট হাউস ও অন্য অন্য বাসগৃহ আছে। হ্রদের ধারে পাহাড়ের গা এমন খাড়া ও কাটা যে ভয় হয় কখন বা ধ্বসিয়া পড়ে। এই গা বহিয়া পথ। তাহাতে ঘোড়া ও চারি-কুলী-বাহিত রিক্স চলে।

নৈনীতাল হইতে হলদোয়ানি। ২৭ মাইল

(৬ই জুন)

সকাল সাড়ে আটটায় আমরা হলদোয়ানি-গামী বাসে নৈনীতাল ত্যাগ করিলাম। বাস ভাড়া ১।০ টাকা করিয়া লাগিল। কাঠগুদাম পর্যন্ত ২২ মাইল পথ প্রায় সবই উৎরাই। নৈনীতাল হইতে ১০ মাইল নামিয়া বীরভট্টি নামক স্থানে রাণীখেত-কাঠগুদাম শড়কের ৪১ মাইলে পড়িলাম। এই শড়কের ৪০ মাইলে ক্রয়ারি আছে। বীরভট্টির এক মাইল পর জলিকোট (৪০০০ ফুট) এক খৃষ্টিয়ান মিশন কেন্দ্র ও মৌমাছি পালনের স্থান। তাহার চারি মাইল পর দোগাও (৩০০০ ফুট) তাহার পাঁচ মাইল পর রাণীবাগ ছাউনি ও সেখান হইতে দুই মাইল অর্থাৎ নৈনীতাল হইতে ২২ মাইলে কাঠগুদাম রেলষ্টেশন ও সহর। এখান হইতে চারি মাইল সমতল পথে চলিয়া হলদোয়ানি সহর আরম্ভ হইল, ও উহার মধ্য দিয়া মাইল খানেক চলিয়া বেলা সাড়ে দশটায় হলদোয়ানি ষ্টেশনে নামিলাম।

ষ্টেশনে দুপুরে স্নানাহার ও বিশ্রাম করিয়া দুইটায় ট্রেণ ধরিয়া চারিটায় বেরেলী জংসনে পৌছিলাম। মধ্যে লালকুয়া নামে এক জংসন ষ্টেশন পড়িয়াছিল। টাঙ্গা করিয়া বেরেলী সহর ঘুরিয়া আসিলাম। বেশ বড় আধুনিক সহর, অন্য কিছু বৈশিষ্ট্য নাই। রাত্রি ষ্টেশনে কাটাইয়া ৭ই জুন ভোর চারিটায় দেরাদুন হইতে আগত এক্সপ্রেস ধরিয়া ৮ই সকালে কলিকাতা পৌছিলাম।

পরিশিষ্ট

(১) বাবা কালিকমলিবালা প্রতিষ্ঠান

যমুনোত্তরী-গঙ্গোত্তরী এবং কেদার-বদরীর কঠিন পথে গিয়াও, ধর্মশালা ও সদাব্রতের ব্যবস্থা করিয়া এই প্রতিষ্ঠান যাত্রীদের মহৎ উপকার করিয়াছে। ইহার প্রবর্তক মহাত্মা কালিকমলিবালা জয়পুর রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং সন্ন্যাসাশ্রমে বিশুদ্ধানন্দ নামে পরিচিত হন।*

কলিকাতার মারোয়াড়ী স্কুল ও মারোয়াড়ী হাসপাতাল স্বামী বিশুদ্ধানন্দের নামের সহিত সংযুক্ত। তাঁহার কালকম্বল-ধারণ বোধ হয় কেদারখণ্ডে বর্ণিত শিবের ভীলবেশের অনুকরণ, আদিবদরী ও লোভার মধ্যের জঙ্গল চটির কথায় যাহার উল্লেখ করিয়াছি।

১৮৯৯ সালে বাবার দেহান্ত হয়। তাহার পূর্বেই তাঁহার শিষ্য—পঞ্জাবের নাথ সম্প্রদায়ের—রামনাথজি এই প্রতিষ্ঠান গঠন আরম্ভ করেন। রামনাথজির উদ্যমে হরদ্বার-ঋষিকেশ সড়ক নির্মিত এবং প্রতিষ্ঠানের ধর্মশালাদি স্থাপিত হয়। ১৯২৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পর জয়পুর রাজ্যের মণিরামজি প্রতিষ্ঠানের কর্তা হইয়াছেন।

---

* "The philanthropic activities of Baba Kali Kamliwala are in prominence throughout the pilgrimage. The origin of the institution dates back to 1884 when Swami Vishuddhananda undertook the pilgrimage in those days when there were no good roads to these places, no dharmsalas and no arrangement of any sort for food stuffs for pilgrims. The pious man garbed himself in a black blanket and was commonly referred to as the Kali Kamliwala. The loss of life and misery sustained on this pilgrimage so impressed the Swami that, on his return, he sent out an S. O. S. appealing for funds to alleviate this distress and it met with an immediate and generous response." (*Sacred Shrines of Uttarakhand* by M. H. Chalmers, p. 1.)

স্বামী আত্মপ্রকাশ নামে সিন্ধুদেশীয় এক সাধু কালিকমলি-বাবার চেলা ছিলেন। রামনাথজির সহিত মতান্তর হওয়ায় তিনি ঋষিকেশের মাইল দুই উজানে গঙ্গার অপর তীরে—স্বর্গাশ্রম নাম দিয়া—পৃথক দেবালয় ও মঠ স্থাপন করেন। ১৯২০ সালে তাঁহার দেহান্ত হয়।

ঋষিকেশ এই প্রতিষ্ঠানের মূল কেন্দ্র, যাহার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী পথের ব্যবস্থা আমরা দেখি নাই। কেদার বদরী পথের সুন্দর ব্যবস্থা নিজেই দেখিয়াছি। ঋষিকেশে প্রত্যেক যাত্রীকে দুই পুরিয়া চূর্ণ দেওয়া হয়, এবং সাধু ও দরিদ্র যাত্রীদিগকে স্থান বিশেষের সদাব্রতের জন্য চিঠি দেওয়া হয়। ঋষিকেশে ও বদরীধামে বৃহৎ সদাব্রত ও দাতব্য ঔষধালয় আছে। কণ্ডি চটি, শ্রীনগর ও কেদারে দাতব্য ঔষধালয় আছে। রামবাড়া ও কেদারে এবং পাণ্ডুকেশর ও বদরীতে এবং তুঙ্গনাথে রাত্রে ব্যবহারের জন্য যাত্রীদিগকে কম্বল ও পট্টু ধার দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের এইরূপ নানা দিকে দৃষ্টি দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়।

ঋষিকেশে এই প্রতিষ্ঠানের দাতাগণের যে মুদ্রিত তালিকা আছে তাহাতে দেখা যে ইঁহারা প্রায় সকলেই নানা প্রদেশস্থ 'মারোয়াড়ী' শেঠ। আর লছমনঝুলার লোহার পুল এবং ত্রিযুগী ও তুঙ্গনাথে উঠিবার পার্বত্য পথও মারোয়াড়ী শেঠ-বিশেষের দানে নির্মিত। তাই বোধ হয় সব প্রদেশের বিশিষ্ট যাত্রীকেই এ দিকের লোক 'শেঠজি' বলে।

(২) গড়বালের ইতিহাস

পশ্চিমে যমুনোত্তরী এবং পূবে বদরী এই তীর্থদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভাগীরথী-মন্দাকিনী-বিষ্ণুগঙ্গা-অলকানন্দা-বিধৌত গঙ্গার প্রভব-দেশ বহুতীর্থ ও পুরাকীর্তির আকর। বর্তমানে উহা টিহরী রাজ্য এবং দেরাদুন ও গড়বাল বৃটিশ জেলায় বিভক্ত হইয়াছে। সমগ্র অঞ্চলকে

উত্তরাখণ্ডও বলা হয়। মোগল যুগে ইহাকে গড়বাল বলা হইত। এই অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস অজ্ঞাত। কেদারখণ্ডে ইহার শৈব তীর্থগুলির মাহাত্ম্য-কীর্তন মাত্র আছে, ইতিহাসের উপাদান কিছু নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এটকিনসন সাহেব তাঁহার *Gazetteer of the Himalayan Districts* নামক বিরাট গ্রন্থে এ অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস প্রথম আলোচনা করেন। বর্তমান *District Gazetteer* গুলির ঐতিহাসিক অংশ উহা হইতে উদ্ধৃত।

ইতিহাস হিসাবে গড়বালকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে হয়—পশ্চিমে হরদ্বার-দেরাদুন, মধ্যে টিহরী-শ্রীনগর, এবং পূবে জোষিমঠ-নন্দপ্রয়াগ। প্রথমে পশ্চিম অঞ্চলের ইতিহাস দেখা যাক। এই অঞ্চলে গড়বালের সর্বপ্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন—দেরাদুন সহরের উত্তর-পশ্চিমে যমুনা নদীর তীরস্থ কলসি গ্রামের নিকট প্রস্তর-গাত্রে খোদা রাজা অশোকের এক লেখ—আছে। সম্ভবতঃ এই স্থান পর্যন্ত অশোকের অধিকার ছিল। এই লিপিতে পাঁচজন গ্রীক রাজার নাম থাকাতে ইহা খৃষ্টপূর্ব ২৫০ অব্দের বলিয়া অনুমিত হয়। তারপর এ অঞ্চলের কোন প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পর্যটক হাওয়েন সাং ও এই লেখের কোন উল্লেখ করেন নাই। ১৩৯৮ সালে তৈমুরলং এই অঞ্চলে অভিযান করেন এবং বোধ হয় তৎকালীন রাজধানী নবাদা পর্যন্ত অগ্রসর হন। তাহার পর ইহা শ্রীনগরের গড়বাল রাজ্য-ভুক্ত হয় এবং দিল্লীর মোগল বাদশাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৬৫৫ সালে শাজাহানের সেনাপতি খলিলুল্লা খাঁ কুমাওন-রাজ বাজবাহাদুরের সহিত এই অঞ্চল আক্রমণ করেন। ইহার প্রায় বিশ বৎসর পরে আরঙ্গজেবের নির্দেশ অনুসারে শিখ গুরুবংশের রাম রায় দুনে আসিয়া ডেরা বা মঠ স্থাপন করেন। তাহাই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া দেরাদুন নামে

নবাদার স্থানে এ অঞ্চলের প্রধান সহর হইয়াছে। এই ডুন গুরু গোবিন্দের দীর্ঘ সাধনার ভূমি, যেখানে সেই—

"দিবা অবসান, যমুনার তীর,
ছোট গিরিমালা, বন সুগভীর,
গুরু গোবিন্দ কহিলেন ডাকি,
অনুচর গুটি ছয়।"

ইহার পর ডুন মোগলদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইতে থাকে এবং ১৭৫৭ সালে উজির নজিব খাঁ রুহিলা কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং পরে মোগল রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া বৃটিশ অধিকারে আসে।

পূবের জোষিমঠ-নন্দপ্রয়াগ অঞ্চল প্রাচীন কালে কুমাওনের কত্যুর রাজাদের অধিকারে ছিল। তাহার কথা কুমাওনের ইতিহাসে বলা হইবে। পরে ইহা শ্রীনগরের গড়বাল রাজাদের রাজ্যভুক্ত হয় এবং গুরখাদের হাত হইয়া বৃটিশ অধিকারে অসিয়াছে।

মধ্যের টিহরী-শ্রীনগর অংশই প্রকৃত গড়বাল। ইহার উত্তরভাগে বারহাট বা উত্তর-কাশীর বিশাল ত্রিশূল এ অঞ্চলের সর্বপ্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে বারহাট হাউয়েন সাং বর্ণিত ব্রহ্মপুর। ইহাই হয়ত কেদারখণ্ডে ত্রিশূলতীর্থ নামে উল্লিখিত হইয়াছে (*The Himalayan Districts*, II, p. 341)। এইরূপ আর একটি ত্রিশূল বারহাট হইতে বহু দূরে চমোলির নিকট গোপেশ্বরের মন্দির-প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান আছে এবং কেদারখণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে। বারহাটের ত্রিশূল ২১ ফুট এবং গোপেশ্বরেরটি ১৬ ফুট লম্বা। প্রাচীন ভারতের লৌহশিল্পের উৎকর্ষের নিদর্শন এই ত্রিশূলদ্বয়ের চিত্র ও বিবরণ এটকিনসন সাহেবের গ্রন্থে আছে। ইহাদের উপরের আদি লেখ তিব্বত অক্ষরে, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং প্রবাদ যে বারহাটের

ত্রিশূল এক তিব্বতীয় রাজার স্থাপিত। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে বারহাট বা প্রাচীন ব্রহ্মপুর এই রাজাদিগের রাজধানী ছিল এবং গোপেশ্বর পর্যন্ত তাঁহাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কেদার, গৌরীকুণ্ড, ত্রিযুগী, গুপ্তকাশী ও তুঙ্গনাথের কাশ্মীরী ধরণের মন্দিরগুলি হয়ত আদিতে ইহারা নির্মাণ করেন।

গোপেশ্বরের ত্রিশূলে পরবর্তী কালের নাগরী অক্ষরের এক লিপিতে আছে যে "গৌড়বংশোদ্ভব, বৈরাথ-কুলতিলক, বোধিসত্ত্বের অবতার অনেকমল্ল এই শিবক্ষেত্রে এই বিজয়স্তম্ভ পুনঃ স্থাপিত করেন।" এই স্থানে প্রাপ্ত আর এক ১১৯১ খৃষ্টাব্দের লেখে আছে যে "অনেকমল্ল কেদারভূমি জয় করিয়া এই [illegible] নির্মাণ করিয়াছেন।" পণ্ডিতদের মতে অনেকমল্ল নেপাল হইতে আসিয়া গোপেশ্বর অঞ্চল অধিকার করেন এবং অল্পকাল মাত্র আধিপত্য করেন।

অনেকমল্লের পর কেদারভূমে কে রাজা হন তাহা জানা যায় না। বোধ হয় এই সময়ে কালীমঠ, ভেতা, নলা, উখিমঠের ওঁকার প্রভৃতি দেবস্থান নির্মিত হয়। প্রবাদ যে এ সকল অসুররাজ বাণ ও তাঁহার বংশধরদের কৃত, গুপ্তকাশীর নিকট শোনিতপুর যাঁহাদের রাজধানী ছিল। সেখানে নাকি এখনও গড়ের চিহ্ন, বাণ ও অনিরুদ্ধের মন্দির ও বাণ-স্থাপিত পঞ্চবক্ত্র শিব-লিঙ্গ আছে, এবং মন্দাকিনীর অপর পারে উখিমঠের স্থান হইতে নাকি বাণাসুরের কন্যা উষাকে অনিরুদ্ধ হরণ করিয়া দ্বারকায় লইয়া যান। এ সব কাহিনীর মূল পাওয়া যায় না। হয়ত কালীমঠের মহালক্ষ্মী-মন্দিরের শিলালেখ হইতে কিছু জানা যাইতে পারে। হয়ত বা এই রাজারা শাক্ত-মতাবলম্বী ছিলেন। তাই আধুনিক-বৈষ্ণব-মতাবলম্বী গড়বালদিগের আমলে অসুর আখ্যা লাভ করেন। যাহা হউক, ইহাদের আমলে এই অঞ্চল যে উন্নত ও

সমৃদ্ধ ছিল, এই মন্দির ও মূর্তিগুলিই তাহার প্রমান। ইহাদের হাত হইতেই বোধ হয় শ্রীনগরের গড়বাল-রাজারা এই অঞ্চল হস্তগত করেন।

গড়বাল রাজবংশের উৎপত্তির কোন ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। জনশ্রুতি হইতে এই রাজবংশের এক তালিকা এটকিনসন সাহেব দিয়াছেন (*The Himalayan Districts,* II, pp. 445—8)। শ্রীনগর ও লোভার মধ্যবর্তী চাঁদপুর অঞ্চলে ইহারা রাজ্যের পত্তন করেন, যাহা ক্রমশঃ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া বিশাল গড়বাল রাজ্যে পরিণত হয়। প্রথম চাঁদপুর, তারপর দেউলগড় ও পরিশেষে অজয়-পালের রাজত্ব কালে (১৩৫৮—১৩৭০) শ্রীনগর এই রাজ্যের রাজধানী হয়। দিল্লীর পাঠান সুলতানদের সহিত গড়বাল-রাজাদের সম্প্রীতি ছিল, এবং সেই জন্য নাকি ১৪৮৩ সালে তৎকালীন গড়বালরাজ পাল উপাধি ত্যাগ করিয়া শাহ্ উপাধি গ্রহন করেন।

মোগল বাদশাদের সহিত বোধ হয় এরূপ সম্প্রীতি ছিল না, কারণ তাঁহারা দুন অঞ্চল আক্রমণ ও পরিশেষে উহা অধিকার করেন। আরঙ্গজেবের ভ্রাতুষ্পুত্র সলোমন শেকো শ্রীনগরে আশ্রয় লওয়ায় তিনি গড়বাল আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে রাজা পৃথিশাহ সলোমনকে বাদশার হস্তে সমর্পণ করেন। এদিকে কুমাওনের চন্দ্ররাজগণ ১৫৬০ সালে চম্পাবৎ হইতে অল্মোড়ায় রাজধানী সরাইয়া আনিয়া গড়বালের লোভা অঞ্চল আক্রমণে প্রবৃত্ত হন। দুই শত বৎসর ধরিয়া দুই রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ চলে। ইহার মধ্যে প্রদীপ শাহের পঞ্চান্ন বৎসর রাজত্ব (১৭১৭—১৭৭২) কিছু শান্তিপূর্ণ ছিল। তারপর অন্তর্বিরোধের ফলে কুমাওনের শক্তি ক্ষীণ হইলে ১৭৭৯ সালে গড়বাল-রাজ ললিত শাহ্ স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র প্রদ্যুম্নকে অল্মোড়া সিংহাসনে বসান। ১৭৮৬ সালে ললিত শাহের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীনগরে রাজা হন কিন্তু

অল্পদিন পরে প্রদ্যুম্নের সেনানীর সহিত যুদ্ধের ফলে পীড়িত হইয়া তিনি মারা যান। তখন প্রদ্যুম্ন কুমাওন রাজ্য ত্যাগ করিয়া শ্রীনগরে গিয়া রাজা হন এবং ১৮০৪ সালে তাঁহার মৃত্যু ও গুরখা-অধিকার পর্যন্ত গড়বালের রাজা থাকেন।

গুরখাদের আদি বাসভূমি গুরখা অঞ্চল কাটমণ্ডুর উত্তরে আট দিনের পথ। তাহার অধিপতি পৃথ্বিনারায়ণ ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে কাটমণ্ডু দখল করিয়া নেপালে গুরখা রাজত্ব স্থাপন করেন। শীঘ্রই বল সঞ্চয় করিয়া গুরখারা রাজ্য-বিস্তারে প্রবৃত্ত হয় এবং ১৭৯০ সালে কুমাওন অধিকার করিয়া শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু বর্তমান ল্যান্সডাউন ছাউনির দশ মাইল পশ্চিমে লাঙ্গুর দুর্গে বাধা প্রাপ্ত হইয়া করের প্রতি-শ্রুতি লইয়া ফিরিয়া যায়। কয়েক বৎসর পরে গুরখারা আবার গড়বাল আক্রমন করে। এবার প্রদ্যুম্ন শাহ পরাজিত হইয়া শ্রীনগর ত্যাগ করিয়া দেরাদুনে আশ্রয় লন এবং ১৮০৪ সালের আরম্ভে ঐ সহরের নিকট গুরখাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রাণ হারান। সমগ্র গড়বাল গুরখাদের কবলে পড়ে এবং নিপীড়িত হইতে থাকে। কালের ফেরে ১৩৫ বৎসর পর সম্প্রতি নেপালের এক গুরখা রাজকুমারীর সহিত এক গড়বাল রাজকুমারের বিবাহ হইল।

বছর দশেক গুরখা রাজত্বের পর ১৮১৫ সালে ভারতে নবোদিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত সংঘর্ষের ফলে গড়বাল গুরখাদিগের হস্তচ্যুত হয়। তখন ঋষিকেশ হইতে রুদ্রপ্রয়াগ হইয়া কেদারের কিছু পশ্চিম পর্যন্ত সীমা টানিয়া ইহার পশ্চিমদিকের ভূভাগ প্রদ্যুম্ন শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুদর্শন পান, আর অবশিষ্ট গড়বাল-রাজ্য গড়বাল জেলা নামে বৃটিশ অধিকারভুক্ত হয়। শ্রীনগর সহর ইহার মধ্যে পড়ে। কিন্তু জেলার হেড্ কোয়ার্টার্স শ্রীনগরের ৮ মাইল দক্ষিণে ৫৩৫০ ফুট উচ্চ

মালভূমির উপর পৌড়ীতে স্থাপিত হয়। গড়বাল-রাজ শ্রীনগরের ৩৫ মাইল উত্তরে ভাগীরথী-তীরে টিহরীতে তাঁহার রাজধানী করেন। তাহা হইতে তাঁহার রাজ্যের নাম টিহরী হইয়াছে। বর্তমান রাজা নরেন্দ্র শাহ্ ঋষিকেশের দশ মাইল উত্তরে পাহাড়ের উপর নরেন্দ্রনগর নাম দিয়া নূতন রাজধানী করিয়াছেন।

যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী তীর্থদ্বয় ও তাহাদের যাত্রা-পথ টিহরী-রাজ্যের অন্তর্গত। কেদারের রাওল সাহেব বৃটিশ গভর্ণমেন্টের কর্তৃত্বাধীন। বদরীর রাওল সাহেব এতদিন টিহরী-রাজের অধীন ছিলেন, সম্প্রতি আইন করিয়া এই ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। কেদার-বদরীর সমস্ত যাত্রা-পথ এবং তাহার উপরের সব দেবস্থান বৃটিশ অধিকারে স্থিত, কিন্তু কুলীরা বেশীর ভাগ টিহরী রাজ্যের অধিবাসী। তাই তাহারা পূর্বে গড়বাল ছাড়িয়া কুমাওনে পদার্পণ করিত না এবং সেইজন্য সীমান্তে রামগঙ্গার উপর মেলচৌরিতে তাহাদিগকে বিদায় দিতে হইত। এখন সে বাধা গিয়াছে।

(৩) উত্তরাখণ্ডের যাত্রীপথ

কেদার বদরী যাত্রা

এই পথের মূল আধার গঙ্গা ও অলকানন্দার ধার দিয়া হরদ্বার হইতে জোশিমঠ পর্যন্ত তিব্বতের পথের ১৬৪ মাইল অংশ। ইহার উপরে স্থিত শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, চমোলি ও জোষিমঠ হইতে পথের শাখা বাহির হইয়াছে। রুদ্রপ্রয়াগ হইতে মন্দাকিনীর ধার দিয়া গুপ্তকাশী হইয়া কেদার (৪৮ মাইল) পৌঁছা যায়। জোষিমঠ হইতে বিষ্ণুগঙ্গার ধার দিয়া বদরীর (১৯ মাইল) পথ। গুপ্তকাশী ও চমোলির মধ্যে ৩০ মাইলের এক সোজা পথ আছে। যাত্রীরা হরদ্বার হইতে রওনা হইয়া রুদ্রপ্রয়াগে মূল পথ ছাড়িয়া দিয়া গুপ্তকাশী হইয়া কেদার

(১৪৩ মাইল) পৌছে। কেদার দর্শন করিয়া গুপ্তকাশী হইয়া চমোলিতে (৫৩ মাইল) আসিয়া মূল পথ ধরিয়া জোষিমঠে উহা ছাড়িয়া বদরীতে (৪৮ মাইল) যায়। বদরী দর্শন করিয়া ঐ পথে চমোলিতে ফেরে এবং সেখান হইতে মূলপথে হরদ্বার (১৩৫ মাইল) অথবা কর্ণপ্রয়াগ (২০ মাইল) অথবা শ্রীনগর (৫৮ মাইল) আসে। কর্ণপ্রয়াগ হইতে গর্নাই (৩৮ মাইল) পৌছিয়া তথা হইতে রামনগর (৬৬ মাইল) অথবা রাণীখেত হইয়া কাঠগুদাম (৭৪ মাইল) গিয়া রেল ধরে। শ্রীনগর হইতে পৌড়ী ও দুগড্ডা হইয়া কোটদ্বার (৬০ মাইল) গিয়া রেল পাওয়া যায়।

আজকাল হরদ্বার ও ঋষিকেশের মধ্যে (১৪ মাইল) মোটর বাস্ চলে। ঋষিকেশ ও দেবপ্রয়াগের মধ্যে (৪৬) মাইল) যাত্রী পথের বিপরীত তীর দিয়া মোটর বাস্ চলিতেছে। ঐ শড়ক শ্রীনগর পর্যন্ত (১৮ মাইল) বাড়ান হইতেছে। ফেরার পথে রাণীখেত ও কাঠগুদামের মধ্যে (৫২ মাইল) মোটর বাস্ চলে। ঋষিকেশ ও দেবপ্রয়াগ ডাণ্ডি ও কুলী নিযুক্ত করার প্রধান স্থান। সম্প্রতি উড়াজাহাজ রুদ্রপ্রয়াগের উত্তরে অগস্ত্য-মুনিতে ও পূবে গোচরে নামিতেছে।

যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী যাত্রা

ইহার কথা পদ্মনাথবাবু এইরূপ লিখিয়াছেন—

"(এই তীর্থদ্বয়ের যাত্রীরা) দেবপ্রয়াগ হইয়া টিহরী (৩৩ মাইল) যায়। তৎপর সেখান হইতে প্রথমতঃ ধারাসু নামক স্থান দিয়া যমুনোত্তরী যায় তারপর উত্তরকাশী (ওরফে বারহাট) আসিয়া গঙ্গোত্তরী দর্শন করিয়া ফিরিয়া আইসে। ফিরিবার সময় মসুরী দিয়া দেবাদুন আসিয়া রেল ধরিতে পারে। কেহ কেহ হরদ্বার হইতে বরাবর রেলে দেরাদুন গিয়া সেইখান হইতে কাণ্ডীওয়ালা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া যমুনোত্তরী গঙ্গোত্তরী দেখিয়া ঐ পথে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে। টিহরী হইতে ধারাসু ৩৫

মাইল, তথা হইতে যমুনোত্তরী ৪০ মাইল, উত্তরকাশী ১৮ মাইল। উত্তরকাশী হইতে গঙ্গোত্তরী ৫৭ মাইল। গঙ্গোত্তরী হইতে গোমুখী ১৮ মাইল।"

"যাহারা সকল তীর্থ দর্শন করে তাহাদিগকে উক্তরূপ যমুনোত্তরী গঙ্গোত্তরী দর্শন পূর্বক গঙ্গোত্তরীর পথে (৩৯ মাইল) ভটবাড়ী নামক স্থানে ফিরিয়া আসিয়া ত্রিযুগী নারায়ণ হইয়া কেদারনাথে যাইতে হয়।" তৎপর বদরী দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। "এইরূপ পর্যটনে প্রায় দুই মাস কাল লাগিয়া থাকে। আবার ভটবাড়ী হইতে ত্রিযুগী নারায়ণের পথ (৬৫ মাইল) অত্যন্ত কঠিন, যাত্রীদের অবস্থান ও আহারাদি করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত চটিও নাকি পাওয়া যায় না। রাস্তাও শড়ক নহে পাকদণ্ডী মাত্র, শীত ভয়ানক।"

আজকাল এ লাইনেও কালিকমলিবাবার প্রতিষ্ঠান হইতে কয়েকটি ধর্মশালা স্থাপিত হওয়াতে যাত্রীদের কষ্ট লাঘব হইয়াছে। পূর্বোক্ত মিষ্টর চামার্স এই চারি তীর্থের ৬৩৩ মাইল পর্যটন ত্রিশ দিনে সমাধা করেন।

(৪) কেদার-বদরী পথ-নির্মাণের ইতিহাস

এই পথের সবটাই বৃটিশ এলাকায় অবস্থিত। মূল পথ—হরদ্বার হইতে জোষিমঠ পর্যন্ত তিব্বতের পথের অংশ—সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট বরাবর যত্নবান ছিলেন। কিন্তু উহার কেদার ও বদরীর দিকের দুই শাখা বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত উপেক্ষিত থাকে। মূলপথেরও প্রায় সমস্ত ১৮৯৪ সালে গহনা হ্রদের প্লাবনে ভাসিয়া যায়। *

* "From Chamoli right away to Hardwar the pilgrim bridle road was completely swept away. The towns of Chamoli, Nandpryag, Karnpryag,. Rudrapryag and Srinagar were completely obliterated. The Hat suspension bridge near Pipalkoti

তারপর যুক্তপ্রদেশগভর্ণমেন্ট ঐ পথের পুনর্নির্মাণ ও সেই সঙ্গে কেদার ও বদরীর দিকের শাখা পথের উন্নতিবিধানে উদ্যোগী হন। কিন্তু সে সময় অর্থাভাবের জন্য রুদ্রপ্রয়াগ ও কেদারের মধ্যের পথ এবং গুপ্তকাশী-চমোলি কর্ড বাকি থাকে এবং জোষিমঠ ও বদরীর মধ্যে পথের সামান্য মাত্র উন্নতি হয়।*

যাহা হউক, গত ত্রিশ পয়ত্রিশ বৎসরে সকল পথই দুরন্ত হইয়া সুগম হইয়াছে। এবং দুইটি মারোয়াড়ী মহোদয়ের কল্যাণে ত্রিযুগী ও তুঙ্গনাথের চড়াই দুইটিও সুগম হইয়াছে। আবার টিহরীরাজ নরেন্দ্র শাহের উদ্যোগে হরদ্বার হইতে দেবপ্রয়াগ ও প্রায় শ্রীনগর তক মোটর বাস্ চলিতেছে। এইরূপ ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে বলিয়া বিভিন্ন বৎসরের যাত্রীরা কেদার বদরীর পথ বিভিন্ন অবস্থায় পাইয়াছেন।

---

is above the point where the Birehganga (on which the Gohna lake formed) joins the Alakananda, but the backwater from the Gohna flood flowed upstream ten miles and washed away the then existing bridge, 60 feet above the bed of the river. All other suspension bridges had their superstructures taken down before the flood. At Chamoli itself there was an iron cantilever bridge of 75 feet span. The cantilevers were removed but a wall of water came down 250 feet high and widened the river from 75 to 240 feet". (*Indian Engineering*, 5 Dec. 1903)

* "In 1901 Sir Anthony Mac Donell gave three lakhs of rupees towards improving the pilgrim roads, and his successor, Sir James LaTouche, has continued his liberal policy. Estimates have been prepared which now work up to about seven lakhs of rupees. They have been curtailed by entirely omitting the portions from Rudrapryag to Gupta Kashi and Kedarnath, and from Gupta Kashi to Tungnath and Mandal, also by only providing for improving the worst portions from Joshimath to Badrinath" (*Indian Engineering*, 5 Dec., 1903.)

(৫) যানবাহন

অধিকাংশ যাত্রী পায়ে হাঁটিয়া যায়, কেহ কেহ মাল বহার জন্য কুলী নিযুক্ত করে। অশক্ত যাত্রীরা অর্থ-সামর্থ্য অনুসারে ডাণ্ডি বা কাণ্ডি করে। কেহ কেহ পথের কঠিন অংশ উঠিতে ঘোড়া ভাড়া করে। কাণ্ডি বাঁশ ও বেতে বুনা শূন্যগর্ভ চেয়ার। উহার গর্ভে মাল পত্র রাখিয়া তাহার উপর যাত্রী বসে। একজন বাহক উহা পিঠে করিয়া লইয়া যায়। যাত্রী পায়ে আরাম পায় বটে কিন্তু ইহাতে বসা নাকি বড় কষ্টকর। ডাণ্ডি ইজিচেয়ারের মত হাল্কা কাঠের কাঠাম, কাপড়ে মোড়া, চারিজন বাহক কাঁধে করিয়া লইয়া যায়। ইহাতে একজন মাত্র আরোহী বসিতে পারে। আবার বেশী ভারি হইলে অতিরিক্ত বাহক লাগে। ডাণ্ডি আরোহীকে কিনিতে হয় এবং মালের জন্য আলাদা কুলী করিতে হয়। খরচ কাণ্ডির চতুর্গুণ লাগে কিন্তু আরামে যাওয়া যায় এবং দেখা ও চিন্তা করিবার সময় বেশী পাওয়া যায়। পায়ে হাঁটিয়া গেলে একটা 'আত্মবশং সুখম্' আছে। আবার কোন কোন অবস্থাপন্ন যাত্রী অন্ততঃ বদরী-দর্শন সমাধা না করিয়া যান ব্যবহার করেন না।

পথের জন্য কুলী ও ডাণ্ডি প্রভৃতি ঠিক করার প্রধান স্থান ঋষিকেশ ও দেবপ্রয়াগ। দুই জায়গায়ই টিহরী দরবার-নিযুক্ত এবং বৃটিশ প্রজা-স্থাপিত এক একটি এজেন্সী বা অফিস আছে, যেখানে কুলীদের রেজিষ্টারি অর্থাৎ নাম ধাম লেখা হয়। এই অফিসে বিভিন্ন যাত্রা পথের দূরত্ব ও কুলী ভাড়ার হার লেখা থাকে। কিন্তু কুলীর বাহুল্য হেতু এই হারের কমেও কুলী মেলে। কুলী রেজিষ্টারি করার নিয়ম এইরূপ— যাত্রী নিজে কুলী সংগ্রহ করিয়া তাহার সহিত ভাড়া ঠিক করিয়া একটি এজেন্সীতে গিয়া রেজিষ্টার-ভুক্ত করাইয়া তাহার নকল বা 'চিঠ্‌ঠি'

করাইয়া লয়। এই চিঠ্‌ঠিতে যাত্রী ও কুলীর নাম ধাম, যাত্রার পথ, এবং কত ভাড়া ঠিক হইল, কত টাকা আগাম দেওয়া হইল, কত রাজকর কাটা হইল—সব লেখা থাকে। এই চিঠ্‌ঠি একখানি যাত্রীকে ও একখানি কুলীকে দেওয়া হয়। পথে কুলী ভাড়ার মধ্যে যাহা লয় তাহা চিঠ্‌ঠির পিঠে লেখা হয় এবং যাত্রা-শেষে হিসাব করিয়া কুলীর প্রাপ্য দিয়া চিঠ্‌ঠি দুই প্রস্থ ফাঁড়িয়া ফেলা হয়। পথে কোন কুলী নিযুক্ত করিলে চটির চৌধুরীর নিকট চিঠ্‌ঠি কাটান যায়।

ঋষিকেশ অথবা দেবপ্রয়াগ হইতে রওনা হইয়া কেদার ও বদরী দর্শন করাইয়া ফিরিয়া আনার ভাড়া—মালের কুলীর জন্য মণকরা ৩০৲, কাণ্ডি সহ কুলী ৪০৲, ডাণ্ডির চারিজন কুলী ১০০৲ টাকা। ইহা শুখ্‌খা ভাড়া অর্থাৎ আহার-ব্যয় কুলীর নিজের। পথের বাহিরের তীর্থে—যথা ত্রিযুগী, তুঙ্গনাথ, কালীমঠ, বসুধারা—লইতে হইলে তাহা বলিয়া ভাড়া ঠিক করিতে হয় এবং চিঠ্‌ঠিতে স্পষ্ট লিখাইয়া লইতে হয়। ফিরিবার সময় কর্ণপ্রয়াগ ও মেলচৌরি দিয়া রাণীখেতে যাইতে কুলীভাড়া বেশী দিতে হয়। আমরা এ জন্য ডাণ্ডির চারি কুলীর ১৩০৲ টাকা এবং মালের কুলীকে মণকরা ৪০৲ টাকা হিসাবে ভাড়া দেই।

ডাণ্ডি আরোহীকে নিজে কিনিতে হয়। উহার দাম টাকা বার পড়ে। ডাণ্ডিতে আগে পিছে দুইটি চামড়ার যোত থাকে। উহাতে লাগাইবার জন্য আরোহীকে রোজ কিছু তেল দিতে হয়।

আবশ্যকীয় কথাগুলির জন্য চিঠ্‌ঠির ফরমে ঘর আছে। তাহা ছাড়া কুলীরা যাত্রীর অতর্কিতে খোরাকী, জলপান প্রভৃতির কথা হাতে লিখাইয়া লইতে চেষ্টা করে। এ বিষয়ে যাত্রীর সাবধান থাকা উচিত এবং কোনরূপ উপরির কথা না লিখাইয়া কুলীরা ব্যবহার-অনুযায়ী পারিতোষিক পাইবে এইরূপ মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেওয়াই নিরাপদ।

কেদার ও বদরী পৌছার দিন এক সের খিচুড়ির মূল্য ॥০ আনা, প্রত্যেক 'বৈঠক রোজ' অর্থাৎ যে দিন মোটেই পথ চলা হয় না তাহার জন্য এক সের আটার মূল্য ।০ আনা, এবং যাত্রা সমাধা হইলে কিছু পারিতোষিক কুলীকে দেওয়ার দস্তুর আছে। তাহা ছাড়া প্রায় প্রত্যহ সকালে জলপান (গুড় ও চবেনা) বাবদ দুই এক পয়সা এবং গুপ্তকাশী, ত্রিযুগী, কালীমঠ, তুঙ্গনাথ, গরুড়গঙ্গা প্রভৃতি অপ্রধান তীর্থে সময়োপযোগী খাবার কুলীরা চাহিয়া থাকে। কুলীরা দরিদ্র ও নম্র-স্বভাব, তাহাদের কঠিন পরিশ্রম ও কষ্ট সহিতে হয়, এবং চটির দোকানে বেশী দামে খাদ্য দ্রব্য কিনিতে হয়। এইসব জন্য তাহারা যথা-সাধ্য সাহায্যের পাত্র। টিহরীর কুলীরা বেশীর ভাগ ব্রাহ্মণ বা ছত্রি কিন্তু কেহই যাত্রার সময় আমিষ (এবং অন্ন) ব্যবহার করে না।

কেদার-বদরীর পথে কাছে কাছে চটি আছে, তাহার কোন কোনটি স্থায়ী বসতি। নীচের দিকের ঘরগুলি খোলা এবং উহাদের খড়ের চাল। প্রায় ঘরের দরজা এবং বারান্দার তীর মাথায় ঠেকে, এই জন্য যাত্রীদের সাবধান থাকিতে হয়। উপরে শীত-প্রধান অঞ্চলে ঘরগুলি ভাল এবং বন্ধ করা যায়। উহাদের চাল কাঠ বা পাথরে ছাওয়া। কালিকমলিবাবার ধর্মশালাগুলি সুনির্মিত। চটিতে যাত্রীদের বাসস্থান এক একটি দোকানের সংলগ্ন। ঘরের জন্য ভাড়া দিতে হয় না কিন্তু যাত্রীকে আহার্য দ্রব্য সব ঐ দোকান হইতে লইতে হয়। এজন্য জিনিসের দাম কিছু বেশী পড়ে। তবে দোকানী যাত্রীকে আবশ্যক মত জল আনিবার ঘড়া ও পাকের বাসন বিনা ভাড়ায় যোগায় এবং পাকের স্থান পরিষ্কার করায়। ধর্মশালায় উঠিলে যে দোকানে ইচ্ছা জিনিস কেনা যায়, কিন্তু পাকের বাসন পাওয়া যায় না।

গড়বাল জেলার সব চটিতে দূরের ঝরণা হইতে লোহার নল দিয়া

জল সরবরাহ হয়। কোথায় কোথায় চটির কাছে ঝরণা বা নদী আছে। প্রত্যেক চটিতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মলত্যাগের জন্য বিভিন্ন স্থান লাল নিশান দিয়া ঘেরা থাকে এবং উহা সাফ করিয়া সন্ধ্যাবেলা ময়লা জ্বালাইয়া দিবার জন্য এক এক জন ভাঙ্গি নিযুক্ত থাকে।

প্রায় যাত্রীই ড়ুবেলা পথ চলে। ভোরে প্রাতঃকৃত্য সারিয়া চটি হইতে বাহির হইয়া বেলা দশটা পর্যন্ত চলিয়া এক চটিতে উঠে। সেখানে স্নানাহার ও বিশ্রাম করিয়া রৌদ্রের তেজ কমিলে বাহির হইয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত চলিয়া এক চটিতে রাত্রের মোকাম করে। এইরূপে গড়ে দিনে পনর ষোল মাইল আগান যায়।

(৬) পাথেয়

কেদার-বদরী যাত্রার প্রথম ও শেষ ভাগ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে পড়ে। উচ্চভূমিতে, অর্থাৎ গুপ্তকাশী বা উখিমঠ হইতে কেদার, তুঙ্গনাথ ও বদরী দর্শন করিয়া জোষিমঠে ফেরা পর্যন্ত দিন পনর শীতপ্রধান অঞ্চলে কাটাইতে হয়। তাহার মধ্যে ঐ তিন তীর্থে ও তাহাদের পাঁচ ছয় মাইল নীচে পর্যন্ত শীত খুব বেশী। যাত্রীর মাল সব কুলীর পিঠে যায়, এবং রোজ বাঁধা ও খোলা করিতে হয়। তাই বিছানা, কাপড় ও অন্য আবশ্যকীয় দ্রব্য যত কম ও যত হাল্কা ওজনের হয় ততই সুবিধা। এক জন যাত্রীর সমস্ত মালের ওজন ত্রিশ সেরের অধিক না হইলে ভাল।

একজন যাত্রীর জন্য সতরঞ্চ বা কম্বল, বিছানার চাদর, বালিস ও লেপ এক এক খানি হইলে চলে। শীতের জায়গাগুলিতে কালিকমলি-বাবার ধর্মশালা হইতে রাত্রে ব্যবহারের জন্য পট্টু ও কম্বল ধার পাওয়া যায়। গড়বালে মশা নাই, তবে কোথায় কোথায় মাছির খুব উপদ্রব।

সূতি কাপড়ের মধ্যে আবশ্যক—ধুতি খান তিনেক, সর্বদা পরার জামা তিনটি এবং এক একটি কোট ও মোটা চাদর এবং হাঁটা যাত্রীর পক্ষে পায়ে জড়ানর জন্য পট্টি এক জোড়া। পথে ধোপা নাই। নীচের দিকে চটিতে সাবান কিনিয়া নদী বা ঝরণার জলে কাপড় ধুইয়া লওয়া যায়।

গরম কাপড়ের মধ্যে আবশ্যক—ড্রয়ার্স বা পাজামা, গঞ্জি, সার্ট ও সোয়েটার। লম্বা কোট বা গরম চাদর না হইলেও চলে। মোজা, জুতা এবং ছাতা আবশ্যক। জুতার ব্যবস্থা ভাল হওয়া চাই। ইহা না করিয়া অনেক যাত্রী পায়ে ঘা হইয়া কষ্ট পান। বড় বড় স্থানে ক্যানভাসের জুতা পাওয়া যায়। বিছানাদি বৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার জন্য একখানি বড় মোমজামা লওয়া উচিত। তালা চাবি ও লণ্ঠন আবশ্যক। স্থানে স্থানে হাসপাতাল ও ঔষধালয় থাকাতে সঙ্গে ঔষধ লওয়া অনাবশ্যক।

চটির দোকানে যে পাকের বাসন পাওয়া যায় তাহাতে সকলের সুবিধা হয় না, আর ধর্মশালায় উঠিলে বাসন পাওয়া যায় না। এই জন্য অল্প স্বল্প পাকের বাসন এবং শৌচের জন্য একটি ঘটি এবং জলের জন্য একটা বালতি লওয়া উচিত। একখানি হাত পাখা লওয়া ভাল।

সাধারণ খাদ্য দ্রব্য চটির দোকানে মেলে। তাহা না কিনিলে দোকানের ঘরে স্থান পাওয়া যায় না। আর কুলীর বোঝা বাড়ানে লাভ নাই। তাই সাধারণ খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে না টানিয়া চটির দোকান হইতে কেনা সুবিধা। চটির ডাইল গলে না। তবে বেসন পাওয়া যায়, অথবা কিছু মুগ ও মসুরের ডাইল সঙ্গে লইলে হয়।

প্রায় চটিতে আটা, চাউল, ডাল (এবং তাহার বেসন,) লবণ, মরিচ, ঘৃত, সরিষার তেল, কেরোসিন, চিনি ও আলু পাওয়া যায়।

কোথায় কোথায় মিষ্ট কুমড়া, কাঁচা কলা এবং পাকা কলা পাওয়া যায়। বড় বড় চটিতে পুরি, পেড়া, জিলেবী মিলে; মেওয়া ও মিছরি প্রভৃতিও পাওয়া যায়। কুলীদের প্রিয় জলপান 'গুড় ও চবেনা' সর্বত্রই মিলে। দুধ ও চা কোন কোন চটিতে পাওয়া যায়।

জিনিসের দর প্রায় এইরূপ—আটা ৶০ হইতে ।০ সের, চাউল ।৵০ হইতে ।৵০, কিন্তু উপরে উঠিলে যেখানে চড়াই ও পথের সঙ্কীর্ণতা-হেতু ছাগলের পিঠে মাল আমদানি করিতে হয় সেখানে আটা ।৵০ ও চাউল ॥০ সের। আলু ও মিষ্ট কুমড়া ৵০ সের। দুধ সাধারণতঃ ৶০ হইতে ।০ সের, কিন্তু বদরীর নিকটে নাকি ॥০ হইতে ১৲ পর্যন্ত সের। ঘৃত ১॥০ সের, ডাইল ৶০, সরিষার তেল ॥০ হইতে ॥৵০, চিনি ।৶০ হইতে ॥০ সের। কেদার ও বদরী ছাড়া সর্বত্র জ্বালানি কাঠ শস্তা। এক পয়সার কাঠে দুই জনের এক বেলার রান্না হয়।

যাত্রা-পথে আমিষের ব্যবহার নিষিদ্ধ দেখিলাম। আমিষাহারীদের ইহাতে অসুবিধা এবং স্বাস্থ্যের হানি হয়। এই কারণে অনেক যাত্রী ও কুলী যাত্রার শেষাশেষি অসুস্থ হইয়া পড়ে। দুধও দুষ্প্রাপ্য।

যান বাহনের ভাড়ার আন্দাজ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। তদনুসারে টাকা লইয়া বাহির হইতে হয়। মোটামুটি ডাণ্ডির জন্য ১৫০৲ টাকা, মালের কুলীর বা কাণ্ডির জন্য ৫০৲ ও অন্যান্য খরচের জন্য ১০০৲ টাকা যথেষ্ট। শেষের দফায়—পথে খাবার খরচ, পাণ্ডাদের দক্ষিণা, মন্দিরে প্রণামী, ভিখারীদেক দান ইত্যাদি ধরা হইল। কিন্তু সব খরচই খুব হাত টানিয়া করিতে হইবে।

পথে ক্ষুদ্র মন্দির ও দেবস্থান সমূহে এবং ভিখারীদের দিবার জন্য কিছু পাই পয়সা সাথে রাখিতে হয়। কেদার ও বদরীতে নোট ভাঙ্গান যায়। চমোলির উপরে টাকা ভাঙ্গান একটু কঠিন।

(৭) কেদারভূমে দেবতা ও দেবস্থান

কেদার বদরী পথের বনাকীর্ণ পার্বত্যপ্রদেশে যে ছোট বড় প্রাচীন দেবালয়-সমূহ দেখা যায় তাহাদের ইতিহাস এবং এই অঞ্চলে উখিমঠ, জোষিমঠ, গোপেশ্বর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের স্থাপনার ইতিহাস জানিতে কৌতূহল হয়। এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য কাল-স্রোতে বিলীন হইয়াছে। সিষ্টর নিবেদিতা তাঁহার *The Northern Tirtha* পুস্তিকায় এই পথের ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মপ্রবাহ সম্বন্ধে স্বীয় ধারণা লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। এটকিনসন সাহেবের গেজেটিয়রে সমগ্র গড়বাল ও কুমাওনের প্রধান দেবস্থানগুলির সংখ্যা ও শ্রেণী বিভাগ উল্লিখিত হইয়াছে *

* "In the Himalayan region we find a curious blending of pre-Brahmanical, Brahmanical and Buddhist practices. To ascertain what is the actual state of religion, it is necessary to examine the forms and ceremonies observed in domestic and temple worship and the deities held in honour, and this is the task that we now propose to undertake for the tract between the Tons and the Kali. For this purpose we possess the results of an examination of the teaching in 350 temples in Kumaon, in about 550 temples in Garhwal and in about 100 temples in Dohra Dun and Jaunsar-Bawar. For the 900 temples in Kumaon and Garhwal we know the locality in which each is situate, the name of the deity worshipped, the broad division to which the deity belongs, the class of people who frequent the temple and the principal festivals observed. The analysis of these lists shows that there are 250 Saiva temples in Kumaon, and 350 in Garhwal and that there are but 35 Vaisnava temples in Kumaon and 61 in Garhwal. Of the Saiva temples 130 in Garhwal and 64 in Kumaon are dedicated to the Sakti or female form alone, but of the Vaisnava temples in both districts only eight". (*The Himalayan Districts*, II. p. 701)

এবং উহাদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকটির এক তালিকা উক্ত গ্রন্থের ৮০৯—৮১৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে।

স্কন্দ পুরাণের মানসখণ্ডে ও কেদারখণ্ডে এই অঞ্চল সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে তাহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ উক্ত গেজেটিয়রে ২৯৭-৩৫০ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। ভারতবর্ষের শিবলিঙ্গ-সমূহের মাহাত্ম্য প্রচারই স্কন্দ পুরাণের উদ্দেশ্য। "Then the earth rejoiced at the establishment everywhere of the *ling* of Mahadeva throughout the nine divisions (*khandas*) of the earth." এ জন্য ইহাতে বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠানগুলির উল্লেখ অতি সামান্য এবং অন্য তথ্য একেবারেই নাই। কিন্তু ইহাতে এই বিশাল ভূখণ্ডের নদ নদী পর্বত ও শৈব দেবস্থানগুলির যে পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ আছে, তাহাতে পুরাণ-রচয়িতার বিপুল জ্ঞান এবং তাঁহার সময়ে এই পার্বত্য দেশের সমৃদ্ধ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুরাণ অবলম্বন করিয়া কেদারভূমির বর্তমান দেবস্থানগুলি চালিত ও তাহাদের মাহাত্ম্য-পুস্তক সকল রচিত হইয়াছে। ইহাতে কামানের উল্লেখ (*The Himalayan Districts*, II, p. 339) এবং শ্রীনগর অঞ্চলকে শ্রীক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ থাকাতে অনুমান হয় যে উহা মোগল যুগের রচনা।

কেদারখণ্ডে শঙ্করাচার্যের কোন উল্লেখ নাই। উহাতে বিষ্ণুর কৃষ্ণ-অবতারের সংশ্লিষ্ট কোন কথা নাই; এবং রাম-অবতারের রামক্ষেত্র, লক্ষ্মণস্থান ও রামকর্তৃক কমলেশ্বরকে কমল-অর্পণ এই তিনটি মাত্র উল্লেখ আছে। তাই মনে হয় যে গড়বালের রাম ও কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় মন্দিরগুলি আধুনিক বৈষ্ণব-মতাবলম্বী গড়বাল-রাজদের আমলের। সেইরূপ কুমাওনের গ্রামে গ্রামে আধুনিক শিব-মন্দিরগুলি একান্ত শিব-ভক্ত চন্দ্ররাজাদের আমলের।

অবস্থান, বিগ্রহ এবং গঠন পদ্ধতি বিবেচনা করিলে, কেদার বদরী পথের প্রাচীন মন্দিরগুলি দুই ভাগে বিভক্ত দেখা যায়। পশ্চিম অঞ্চলে, অর্থাৎ মন্দাকিনীর উপত্যকায় এবং ভীলকেদার ও রুদ্রপ্রয়াগের মধ্যে অলকানন্দা-উপত্যকায়, মন্দিরগুলিতে শিব প্রতিষ্ঠিত এবং এই অঞ্চলে উখিমঠ অবস্থিত। পূর্ব অঞ্চলে, অর্থাৎ বিষ্ণুগঙ্গার উপত্যকায় এবং ভবিষ্যবদরী ও আদিবদরীর মধ্যে অলকানন্দা উপত্যকায়, বিষ্ণু মন্দিরের প্রাধান্য এবং এই অঞ্চলে জোষিমঠ অবস্থিত। এই দুইয়ের সন্ধিস্থলে গোপেশ্বরের মন্দির।

অগস্ত্যমুনি সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। এখানে মন্দিরটি ক্ষুদ্র, কিন্তু বসতির মধ্যে বৃহৎ চত্বরে অবস্থিত। এ বিষয়ে কমলেশ্বরের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু অগস্ত্যমুনি, শৃঙ্গি প্রভৃতি নামে যে সকল বৃহৎ ধাতু-নির্মিত মূর্তিগুলি এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার সদৃশ মূর্তি এ অঞ্চলে কোথায়ও নাই। এগুলি বোধ হয় প্রাচীন বৌদ্ধ মূর্তি।

পশ্চিম-গড়বালের মন্দির

কেদারের পথের প্রধান মন্দিরগুলি—কেদার, গোরীকুণ্ড, ত্রিযুগী, গুপ্তকাশী, তুঙ্গনাথ এবং গোপেশ্বর—এক ধরণের। ইহাদের উচ্চ গর্ভ-গৃহের বহির্গাত্র ঈষৎ ঢালু এবং শিখর চতুষ্কোন চাল দ্বারা তুষারপাত হইতে রক্ষিত। সামনের কক্ষ বা জগমোহন গ্রীক pediment ধরণের ত্রিকোণ সম্মুখ-বিশিষ্ট দোচালা। এই গঠন দেখিয়া কাশ্মীরের বিখ্যাত মার্তণ্ড-মন্দিরের ভগ্নাবশেষের কথা মনে হয়। ইহাদের মধ্যে একমাত্র গোপেশ্বর-মন্দিরে লেখ পাওয়া যায়, যাহাতে লিখিত আছে যে উহা ১১৯১ সালে নির্মিত। অন্য মন্দিরগুলিও হয়ত ঐ সময়ের। কেদারের মন্দির নাকি গোয়ালিয়রের রাজা কর্তৃক উনবিংশ শতাব্দীতে পুনর্নির্মিত (*Notes of Travel* by J. Nelson Fraser, p. 168)।

ইহা ছাড়া গুপ্তকাশী অঞ্চলে নলা, ভেতা, কালীমঠ প্রভৃতি স্থানে যে মন্দিরগুলি আছে তাহা পরবর্তী কালের কোন শাক্ত-মতাবলম্বী রাজাদের আমলের বলিয়া মনে হয়। এ সব মন্দিরে এখন ফাটা অঞ্চলের গৌড়ীয় ব্রাহ্মণেরা কতৃত্ব করেন। ইহারা হয়ত শাক্ত-মতাবলম্বী। কিন্তু শুনিলাম যে এখন এ অঞ্চলে ধুয়া উঠিয়াছে যে ব্রাহ্মণের পক্ষে মাংস-ভক্ষণ অশাস্ত্রীয়।

পূব-গড়বালের মন্দির

এ অঞ্চলের প্রাচীন তিন মন্দির—পাণ্ডুকেশবে দুইটি এবং বদরী—এক ধরণের। উহাদের বহির্গাত্র (কৈলাস পর্বতের চূড়ার ধরণে নাকি) নীচে সোজা ও উপরে বৃত্তাভাস। মন্দিরের সামনের প্রবেশ কক্ষ সামান্য। বদরীর বর্তমান মন্দির পুনর্নির্মিত এবং উহার মধ্যের ও প্রবেশের কক্ষ দুইটি আধুনিক। পাণ্ডুকেশবে রক্ষিত এক তাম্রশাসনে কত্যুর রাজা পদ্মট কর্তৃক বদরী-মন্দিরে দেবত্রদানের কথা আছে, এবং অন্য শাসন হইতে জানা যায় যে (নবম শতাব্দীতে) জোষিমঠ অঞ্চল তাঁহাদের অধীন ছিল। এই মন্দিরত্রয় হয়ত আদিতে তাঁহাদের স্থাপিত। বদরী ও যোগবদরী বুদ্ধ মূর্তি, এবং বৈজনাথের পুরাতন মূর্তিগুলির মধ্যে নাকি একটি বুদ্ধ মূর্তি আছে (*Almora Gazetteer*, p. 213)। অনুমান হয় যে কত্যুর-রাজগণ এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের পূজিত বুদ্ধদেবকে বিষ্ণু বা বদরীনারায়ণে রূপান্তরিত করিয়া লন।

যোগবদরীর পাশের মন্দিরে চতুর্ভুজ মূর্তি আছে। ইহা কোন সময়ে স্থাপিত তাহা বলা যায় না। কিন্তু অন্য সব বিষ্ণু-মূর্তি—জোষিমঠে বাসুদেব, বৈজনাথে (তল্লিহাটে) সত্যনারায়ণ, এমনকি আদিবদরীও—চতুর্ভুজ মূর্তি। দ্বারাহাটের বদরীরও হয়ত এই মূর্তি

ছিল। এই মন্দিরগুলি এক ধরণের, এবং সম্ভবতঃ একাদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে নানা শাখায় বিভক্ত কত্যুর-রাজাদের নির্মিত।

এই সকল স্থানে বিষ্ণুর সহিত শিবও প্রতিষ্ঠিত আছেন। বৈজ-নাথের চণ্ডীমূর্তির ও তল্লিহাটের সত্যনারায়ণ-মূর্তির পাথর ও নির্মাণ-কৌশল এক। আবার ইহাদের অদূরে কত্যুরদের রণচুলা-কোটে দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন, যাঁহার সামনে এখনও বলি হয় (*Almora Gazetteer*, p. 213)। তাই বোধ হয় যে কত্যুরগণ বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয় মতই পোষণ করিতেন।

উখিমঠ প্রতিষ্ঠান

এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ রাওল সাহেব দাক্ষিণাত্যের জঙ্গম শ্রেণীর শৈব। তাঁহার অধীনস্থ সাতটি প্রধান দেবস্থানের চারিটিতে পূজারী জঙ্গম, আর তিনটিতে পূজারী স্থানীয় ব্রাহ্মণ। ইহাদের ব্যবস্থা এইরূপ—

কেদার—গ্রীষ্মের ছয় মাস মাত্র মন্দির খোলা থাকে। পূজারী জঙ্গম। পাণ্ডা শোণিতপুর-বাসী ব্রাহ্মণ।

উখিমঠে ওঁকারনাথ প্রভৃতি—পূজারী জঙ্গম।

ত্রিযুগী [illegible]—পূজারী রবি (ফাটা) গ্রামের গৌড় ব্রাহ্মণ। পাণ্ডা স্থানীয় ব্রাহ্মণ।

গুপ্তকাশীতে বিশ্বেশ্বর—পূজারী জঙ্গম।

কালীমঠ—পূজারী নিকটের কবিলটা গ্রামের শাক্ত ব্রাহ্মণ।

মধ্যমেশ্বর—গ্রীষ্মের ছয় মাস মাত্র খোলা থাকে। পূজারী জঙ্গম।

তুঙ্গনাথ—গ্রীষ্মের ছয় মাস মাত্র খোলা থাকে। পূজারী ও পাণ্ডা মকু গ্রামের ব্রাহ্মণ।

এই সকল দেবস্থানের জন্য পূর্ব রাজাদের দত্ত গুঁট আছে। এই সব হইতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে রাওল সাহেব বিগ্রহের পূজা ও মন্দির সমূহের ব্যবস্থা করেন। সিষ্টর নিবেদিতা লিখিয়াছেন যে পূর্বের গড়বাল রাজাদের সনদের বলে উখিমঠ স্থাপিত। হিমালয়স্থ এই প্রতিষ্ঠান কিরূপে সুদূর দক্ষিণের সম্প্রদায়-বিশেষের হস্তে ন্যস্ত হইল তাহা প্রহেলিকাময়। বর্তমান রাওল সাহেব নাকি লিঙ্গায়েৎ-কেন্দ্র বেলারি জেলা হইতে আসিয়াছেন। রাওল উপাধিও অদ্ভুত। হয়ত —বর্তমান মহারাজের মত—পূর্বে মোহন্তদের এই উপাধি ছিল।

জোষিমঠ প্রতিষ্ঠান

এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ রাওল সাহেব মালাবার উপকূলের নম্বুরী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহার অধীনস্থ দেবস্থানগুলির মধ্যে আমরা যে কয়টি দেখি তাহাদের ব্যবস্থা এইরূপ—

বদরীনারায়ণ—গ্রীষ্মের ছয় মাস মাত্র মন্দির খোলা থাকে। পূজারী স্বয়ং রাওল সাহেব। পরিচারক ও ভোগ-পাচক চমোলির নিকটস্থ ডিমরি গ্রামের গৌড় ব্রাহ্মণ। পাণ্ডা ১২৫ মাইল দূরের দেব-প্রয়াগের মহারাষ্ট্রীয়-বংশোদ্ভব ব্রাহ্মণ।

পাণ্ডুকেশবে যোগবদরী—পূজারী ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের স্মার্ত বা আয়ার ব্রাহ্মণ।

জোষিমঠে নৃসিংহবদরী—পূজারী তাঞ্জোর জেলার স্মার্ত ব্রাহ্মণ।

জোষিমঠে বাসুদেব—কোয়েম্বাটোর জেলার স্মার্ত ব্রাহ্মণ।

ইহা ছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য দেবস্থান—দ্বারাহাটের বদরী—নাকি জোষিমঠের অধীন (*Almora Gazetteer*, p. 235)।

এ সব দেবস্থানের জন্য পূর্ব রাজাদের দত্ত গুঁট আছে। যাত্রী হইতেও বেশ আমদানি হয়। ইহাদের উপর এতদিন রাওল সাহেব

একরূপ সর্বময় কর্তা ছিলেন।* সম্প্রতি (১৯৩৯ সালে) আইন পাশ হইয়া কার্য নির্বাহের জন্য তাঁহার সহিত এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে।

জোষিমঠ সম্ভবতঃ গড়বাল রাজাদের আমলে স্থাপিত। কিন্তু এই বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব কিরূপে দক্ষিণের শৈবমতাবলম্বীদের হাতে গেল তাহা রহস্যাবৃত। এই মঠ শঙ্করাচার্য স্থাপন করেন বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহা অমূলক মনে হয় কারণ ইঁহাদের সহিত শঙ্করের প্রবর্তিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কোন সম্বন্ধ নাই। আর শঙ্করই বা কেন বৈষ্ণব মঠ স্থাপন করিবেন? বোধ হয় রাওল সাহেবেরা শঙ্করের শ্রেণীর নম্বুরী ব্রাহ্মণ বলিয়া এই প্রবাদ উঠিয়াছে।

পঞ্চকেদারের অনুকরণে পঞ্চবদরী হইয়াছে—বদরী, যোগবদরী, উরগম্ গ্রামে ধ্যানবদরী, অনিমঠে বৃদ্ধবদরী এবং আদিবদরী (অথবা কাহারও মতে ভবিষ্যবদরী)। উরগম্ কুমারচটির উত্তরে। অনিমঠ কুমারচটির নিকটে। ভবিষ্যবদরী জোষিমঠের ১৩ মাইল পূর্বে নিতির পথে।

গোপেশ্বর প্রতিষ্ঠান

এই প্রতিষ্ঠান পূর্বে উখিমঠের অধীন ছিল, এখন স্বতন্ত্র হইয়াছে। ইহার অধ্যক্ষ বা রাওল সাহেব দাক্ষিণাত্যের জঙ্গম। তাঁহার গদি গোপেশ্বরের মন্দির-চত্বরে অবস্থিত। পঞ্চবদরীর অন্তর্গত রুদ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত। তাঁহার নিজ মন্দিরে গ্রীষ্মের ছয় মাস মাত্র পূজা হয়। গোপেশ্বর ও রুদ্রনাথ উভয়ের পূজারী স্থানীয় ব্রাহ্মণ।

* "In 1896 a suit was instituted by the Local Government with the result that now the sole management of the secular affairs of the temple rests with the Rawal subject to the control of H. H. the Raja of Tehri Garhwal. The Rawal must be a Namburi Brahman from Southern India and a member of the priestly class of his clan." (*Garhwal Gazetteer*, p. 146)

এ দিকের সমস্ত বিশিষ্ট মহাদেবই অনাদিরূপী অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রস্তর শৃঙ্গ। গোপেশ্বর নির্মিত লিঙ্গ এবং বদরী প্রভৃতি বিষ্ণুমূর্তির মত যাত্রীদের অস্পৃশ্য। গোপেশ্বর মন্দিরের বাহিরে খুব প্রাচীন এক বিষ্ণুমূর্তি পড়িয়া আছে এবং রাওল সাহেবের গদির নিকট "স্বতন্ত্র দ্বিতল প্রকোষ্ঠে লক্ষ্মীদেবী আছেন।" গোপেশ্বর নাম শিব অপেক্ষা কৃষ্ণেরই উপযুক্ত। তাই মনে হয় যে পূর্বে এখানে বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু নাম ও অর্চনা বৈষ্ণব ধরণের রহিয়া গিয়াছে। গোপেশ্বরে প্রাপ্ত লেখ হইতে দেখা যায় যে পূর্বে ইহা শিবক্ষেত্র ছিল, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এখানে অনেক মল্ল কর্তৃক শ্রীপদ্মপাদ-মন্দির নির্মিত হয়। তাহাতেই হয়ত এখন গোপেশ্বর লিঙ্গ স্থাপিত। কেদারখণ্ডে এ স্থানের নাম গো-স্থল।

(৮) কুমাওনের ইতিহাস

বর্তমান অল্মোড়া ও নৈনীতাল এই দুই জেলা মিলিয়া কুমাওন প্রদেশ। এই প্রকাণ্ড ভূভাগ এক সময় অল্মোড়ার চন্দ্র উপাধিধারী রাজাদের অধিকৃত ছিল, এবং তাঁহাদের আদি বাসভূমি কালীনদী তীরস্থ কূর্মাচল হইতে কুমাওন নাম প্রাপ্ত হয়। ইহার পর্বতময় উত্তরভাগ প্রকৃত কুমাওন, যাহাতে কুমাওনের রাজধানী এবং প্রধান নগর দুর্গ ও তীর্থ সকল অবস্থিত। দক্ষিণের সমতল ভাগ রুহিলখণ্ডের অংশ-বিশেষ। উহা ক্রমশঃ কুমাওন রাজ্যে সংযুক্ত হইয়া পূবে কালী বা সারদা নদী ও পশ্চিমে রামগঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রাজা রুদ্রচন্দ্রের আমলে (১৫৬৫-১৫৯০) দৈর্ঘ্য হইতে চৌরাশি-কোশ মহল ও রাজস্বের পরিমাণ হইতে নওলাখিয়া মহল নাম প্রাপ্ত হয়। ইহাতে পশ্চিমে কাশীপুর, মধ্যে হলদোয়ালি ও পূবে টনকপুর বর্তমানে প্রধান বাণিজ্য ও শাসনকেন্দ্র। কালাগড়, রামগড়, কাঠগুদাম ও টনকপুর এই চারি

rail-head এর মধ্য দিয়া লাইন টানিলে উহা উত্তর ও দক্ষিণ ভাগদ্বয়কে বিভক্ত করে।

দক্ষিণভাগে কাশীপুরের নিকটে প্রাচীন পাঞ্চালের রাজধানী অহি-ক্ষেত্রের স্থান নির্দেশিত হয়। এখানে নাকি দ্রোণসাগর নামে বৃহৎ তড়াগ ও অন্য প্রাচীন নিদর্শন আছে (*Nainital Gazetteer*, p. 274)। কাশীপুরের বর্তমান রাজা চন্দ্র রাজবংশের এক শাখা হইতে উদ্ভূত।

কত্যুর রাজত্ব

উত্তরের পার্বত্য কুমাওনে কোন প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। পণ্ডিতদের অনুমান যে এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা খাসিয়া-জাতীয় ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল, এবং তাহাদের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল নৈনীতালের উত্তর-পূবে রামগড়। অষ্টম শতাব্দীতে অল্মোড়া সহরের উত্তরস্থ গোমতী নদীর উপত্যকায় এক হিন্দু রাজ-বংশের অভ্যুদয় হয়। বর্তমান বৈজনাথ বা তাহার নিকটে কোন স্থানে কার্তিকেয়পুর নামে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। তাহা হইতে এই রাজবংশের ও তাঁহাদের আদি বাসভূমির নাম কত্যুর হইয়াছে। প্রবাদ যে কোন সূর্যবংশী ক্ষত্রিয় অযোধ্যা হইতে আসিয়া এই রাজ্য স্থাপন করেন। হয়ত সেই কারণে এই অঞ্চলের প্রধান নদী দুইটির নাম সরযূ ও গোমতী হইয়াছে। কত্যুরগণ ক্রমশঃ খাসিয়া প্রধানদিগকে বশীভূত করিয়া উত্তরে বদরীধাম পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন।

কার্তিকেয়পুর হইতে দত্ত ছয়খানি লেখ পাওয়া গিয়াছে। তাহার চারিখানি তাম্রফলক পাণ্ডুকেশব মন্দিরে আছে, একখানি তাম্রফলক (অল্মোড়া সহরের পঞ্চান্ন মাইল পূবে) বালেশ্বর মন্দিরে আছে, এবং এক প্রস্তর লিপি (অল্মোড়ার সাতাশ মাইল উত্তরে) বাঘেশ্বর মন্দিরে গ্রথিত আছে (*The Himalayan Districts*, II, pp. 467-485)।

ইহার মধ্যে পাণ্ডুকেশবের দুইখানি ফলক ও বাঘেশ্বর প্রস্তরলিপি হইতে এক বংশের সাতজন রাজার নাম পাওয়া যায়। উঁহাদের একজন ললিতশূর দেব একবিংশ ও দ্বাবিংশ রাজ্যাব্দে এই দুই তাম্র-শাসন দ্বারা এক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করেন। ইহার প্রথম খানিতে বৃষ সীল সংযুক্ত আছে এবং দ্বিতীয়তে তপোবন গ্রামের উল্লেখ আছে। বাঘেশ্বর-লিপি ললিতের পুত্র ভূদেবের ঐ মন্দিরে দেবত্র-দানের শাসন। ইহাতে ভূদেব "a zealous worshipper of Brahma, an enemy of Budha Sravana" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। গৌড়ের পাল-বংশীয় রাজাদের শাসনের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া এটকিনসন সাহেব এই লেখগুলিকে নবম শতাব্দীর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আর তিনখানি লেখ হইতে—পরবর্তী অন্য এক কত্যুর বংশের—পাঁচজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এই লেখের একখানি বালেশ্বরে রক্ষিত রাজা দেশটের পঞ্চম রাজ্যাব্দে বিজয়েশ্বরের (সম্ভবতঃ বালেশ্বরের পূর্ব নাম) মন্দিরে দেবত্র-দানের শাসন। দ্বিতীয়খানি পাণ্ডুকেশবে রক্ষিত দেশটের পুত্র পদ্মটের পঞ্চবিংশ রাজ্যাব্দে বদরী মন্দিরে দেবত্র-দানের শাসন। তৃতীয়খানি পাণ্ডুকেশবে রক্ষিত পদ্মটের পুত্র সুভিক্ষ দেবের চতুর্থ রাজ্যাব্দে সুভিক্ষপুর (সম্ভবতঃ কার্তিকেয়পুরের নামান্তর) হইতে দুই ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের শাসন। দেশট ও পদ্মট শৈব-মতাবলম্বী এবং সুভিক্ষ দেব "a Vaisnava, devoted to the supreme Brahma and a patron of those learned in the Sastras" ছিলেন। কার্তিকেয়পুরের এই রাজাদের সময় বোধ হয় বদরী, পাণ্ডু-কেশব ও তপোবনের প্রাচীন মন্দিরগুলি নির্মিত হয়।

ইহার পর আর কার্তিকেয়পুর বা সুভিক্ষপুরের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তখন কত্যুর রাজের একাধিপত্য লোপ পায় এবং কত্যুরগণ

নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া ডোটি বা শিরা, আস্কোট, কত্যুর বা বৈজনাথ এবং পালি বা দ্বারাহাট কেন্দ্রে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এটকিনসন সাহেব এই সব শাখা রাজ-বংশের তালিকা দিয়াছেন (*The Himalayan Districts*, II, pp. 530, 531, 536 and 553)। আদিবদরী; দ্বারা, বৈজনাথ, বাগেশ্বর, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থানের সুন্দর মন্দির ও মূর্তিসমূহ এই শাখা রাজগণের উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দিতেছে। দ্বারার মূর্তিতে দ্বাদশ শতাব্দীর এবং অন্যত্র ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখ পাওয়া গিয়াছে। (*The Himalayan Districts* II, p. 520.) ইহার পর খণ্ড কত্যুর রাজ্যগুলি ক্রমশঃ বিজিত হইয়া নবোত্থিত চন্দ্ররাজগণের কুমাওন-রাজ্য-ভুক্ত হয়। চন্দ্ররাজগণ নাকি কত্যুর-কন্যাদিগকে বিবাহ করিতেন কিন্তু নিজ কন্যাগণকে কত্যুর বংশে বিবাহ দিতেন না (*Ibid.*, p. 495)। ডোটির কত্যুর রাজের রায়াণ-কা-রাজা বা রাজাধিরাজ উপাধি ছিল এবং চম্পাবতে চন্দ্রদিগের উত্থান সময়ে তিনি ঐ অঞ্চলের অধিরাজ বলিয়া গণ্য হইতেন। ডোটির এক রাজওয়ারা বা যুবরাজ অজয় পাল ১২৭৯ সালে ডোটি ত্যাগ করিয়া আস্কোটে পৃথক রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরের আজিও সেই উপাধি। (*The Himalayan Districts*, II, p. 532 ; সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্যের মানসরোবর ও কৈলাস, পৃষ্ঠা ২৫)

বালেশ্বর মন্দিরে রক্ষিত দেশট দেবের তাম্র শাসনের পৃষ্ঠে নেপালের দুলু নগরের বৌদ্ধ রাজা ক্রাচল্ল দেবের ১২২৩ সালের এক লেখ খোদা আছে যাহা হইতে তাঁহার এই শিরা অঞ্চল দখল করার কথা জানা যায় আবার উহার নীচে বিক্রমচন্দ্রের ১৪২৩ সালের লেখ হইতে জানা যায় যে সে সময় উহা চন্দ্রদের অধিকারে আসে (*The Himalayan Districts*, II, p. 528).

চন্দ্ররাজত্ব

চন্দ্র রাজগণের অভ্যুদয়ের ইতিহাস অজ্ঞাত। এটকিনসন সাহেব এই বংশের রাজাদের এক তালিকা দিয়াছেন (*The Himalayan Districts*, II, pp. 500-501)। প্রবাদ যে এই রাজবংশের স্থাপয়িতা সোমচন্দ্র চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন, এবং প্রয়াগের বিপরীত তীরের ঝুসি (প্রাচীন প্রতিষ্ঠানপুর) হইতে আসিয়া কালীনদীর পশ্চিম তীরস্থ অঞ্চলের কত্যুর বংশীয় ব্রহ্মদেবের কন্যাকে বিবাহ করিয়া চম্পাবৎ দুর্গ নির্মাণ করেন এবং ৯৫৩ সালে অপুত্রক ব্রহ্মদেব মৃত হইলে তাঁহার স্থানে এই অঞ্চলের অধিপতি হন। সোমচন্দ্রের নাকি জোষী, বিষ্ট ও পাণ্ডা উপাধিধারী কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ কামদার ছিলেন, যাঁহাদের বংশধরগণ চন্দ্র-রাজত্বে যুদ্ধে ও শাসনকার্যে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। আবার ইঁহাদের বংশধরগণ এখন কুমাওনে প্রতিপত্তিশালী।

১৫৬০ সালে অল্মোড়ায় স্থানান্তরিত হইবার পূর্বে চম্পাবৎ দুর্গ চন্দ্রদের রাজধানী ছিল। উহা কুমাওনের পূর্ব সীমান্তে কালীনদী তীরবর্তী পর্বতের উপর ৫৪৬০ ফুট উচ্চে, অল্মোড়া সহর হইতে ৫৪ মাইল দক্ষিণ-পূবে, লোহাঘাটের আট মাইল দক্ষিণে এবং টনকপুর রেল ষ্টেশনের ২৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। চন্দ্ররাজগণের এই আদি বাসভূমি কূর্মাচল বা কুমাওন এক বিশিষ্ট অঞ্চল। মানসখণ্ডে ইহার মধ্য দিয়া কৈলাস-যাত্রার পথ নির্দেশিত আছে। আধুনিক কালে লোহাঘাটের দুই মাইল দূরে স্বামী বিবেকানন্দের মায়াবতী আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে, এবং টনকপুরের উত্তরে ব্রহ্মদেবমণ্ডি নামক স্থানে সারদা-ক্যানেলের হেড্ ওয়ার্কস্ নির্মিত হইয়াছে।

সোমচন্দ্রের পর প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া চন্দ্রদের নাম বিশেষ শুনা যায় না। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পাদে রাজা গরুড় জ্ঞানচন্দ্র

(১৩৭৪—১৪১৯) দিল্লীর পাঠান সুলতানের আনুকূল্যে দক্ষিণের কতক সমতল ভূমি হস্তগত করেন। তাঁহার পৌত্র উদ্যানচন্দ্র এক বৎসর রাজত্ব মধ্যে রাজ্যের বিস্তার করেন এবং বালেশ্বর মন্দিরের সংস্কার আরম্ভ করিয়া যান—যে কার্য বিক্রমচন্দ্র ১৪২৩ সালে সমাপন করিয়া ঐ মন্দিরে রক্ষিত দেশটদেবের তাম্রফলকের পৃষ্ঠে লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু ১৪৩৭ সালে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভারতী খাসিয়াদের সাহায্যে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন।

ভারতী ও তাঁহার বংশধরগণের ১২৩ বৎসর রাজত্ব গৌরবময়। ভারতী স্বয়ং বহু বৎসরের চেষ্টায় ডোটির রায়ান-কা-রাজাকে পরাজিত ও ডোটি লুণ্ঠন করিয়া চম্পাবতের প্রাধান্য স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র রতনচন্দ্র (১৪৫০—১৪৮৮) কিছু দিনের জন্য শোর বা পিঠোরগড় অধিকার করায় এই প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। রতনচন্দ্র নিজকে বিশেষ অনুগ্রহভাজন মনে করিয়া জাগেশ্বরের মন্দিরে অনেক দেবত্র দিয়া যান। তাঁহার পুত্র কীর্তিচন্দ্র (১৪৮৮—১৫০৩) এই বংশে সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ও কৃতী রাজা ছিলেন। তিনি কত্যুরদের হাত হইতে বিসোদ বা অল্মোড়া অঞ্চল, এবং পালি বা দ্বারাহাট অঞ্চল, এবং [illegible] হাত হইতে নৈনীতালের পশ্চিমের কোটা অঞ্চল, আর কাঠি রাজপুতদের হাত হইতে ফলদাকোট বা কুশীর উপত্যকা ভূমি অধিকার করিয়া পশ্চিমে রামগঙ্গা নদী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ইহার পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর চন্দ্রদের অধিকার স্থির থাকিয়া ভীষ্মচন্দ্রের সময় (১৫৫৫—১৫৬০) পূবে ডোটি ও পশ্চিমে পালি অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। উহা দমন করি[illegible] সুশাসনের জন্য ভীষ্মচন্দ্র চম্পাবৎ হইতে রাজ্যের মাঝখানে অল্মোড়ায় (কত্যুরদের খাগমারা দুর্গে) বাস উঠাইয়া আনেন। সেখানে নিদ্রাবস্থায় রামগড়ের এক খাসিয়া সর্দার তাঁহাকে নিহত করে।

তাঁহার পোষ্যপুত্র বাল কল্যাণ অবিলম্বে এই হত্যার প্রতিশোধ লন এবং অল্মোড়াতে রাজধানী কায়েম করেন। অল্মোড়া রাজধানী হইতে বাল কল্যাণ ও তাঁহার বংশধরগণ দেড়শত বৎসরের উপর কৃতিত্বের সহিত রাজত্ব করেন। দক্ষিণে তাঁহাদের সমসাময়িক—আকবর হইতে আরঙ্গজেব—প্রবল মোগল বাদশাদের সহিত সম্প্রীতি রাখিয়া তাঁহারা কত্যুর, ভুটিয়া প্রভৃতি খণ্ড রাজ্যগুলি জয় করিয়া লইয়া এক প্রকাণ্ড রাজ্য গঠন করেন, যাহা তাঁহাদের আদি বাসভূমি কুমাওনের নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই সময় হইতে কুমাওন-রাজগণ গড়বালের উর্বর লোভা অঞ্চল দখল করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতে থাকেন। দুই শত বৎসর ধরিয়া উভয় রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ চলে। এই সময়ের কুমাওন-রাজগণ বহু দেবত্র ও ব্রহ্মত্র দান করিয়া গিয়াছেন এবং কুমাওনের অসংখ্য আধুনিক শিব-মন্দিরগুলিও এই আমলে নির্মিত।

বাল কল্যাণ পাঁচ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। তাহার মধ্যেই তিনি সরযূ ও রামগঙ্গার মধ্যবর্তী গঙ্গোলি, ও তাহার উত্তরের খাসিয়া-অধ্যুষিত দানপুর জয় করিয়া লন এবং তাঁহার শ্যালক ডোটির রায়ানকা-রাজার নিকট হইতে শোর বা পিঠোরগড় অঞ্চল হস্তগত করেন। তাঁহার পুত্র রুদ্রচন্দ্র (১৫৬৫—১৫৯৭) পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ আকবর বাদশার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজ্যের দক্ষিণাংশ মোগল-আক্রমণ হইতে নির্মুক্ত করেন। তারপর তিনি স্বীয় মাতুলের রাজ্য রামগঙ্গা ও কালীনদীর মধ্যবর্তী ডোটি বা শিরা আক্রমণ করেন। বহু বৎসর ধরিয়া নিষ্ফল চেষ্টার পর ১৫৮০ সালে তাঁহার সেনাপতি গঙ্গোলির পুরুষোত্তম বা পরথু শিরা দুর্গ অধিকার করিলে এ অঞ্চল রুদ্রচন্দ্রের রাজ্যভুক্ত হয়। তদবধি কত্যুর বংশোদ্ভব আস্কোটের রাজওয়ারা সাহেব জমিদার রূপে গণ্য হইতেছেন। শিরা-জয়ের জন্য রুদ্রচন্দ্র পরথুকে যে

ভূমিদান করেন তাহার তাম্রশাসন গঙ্গোলিতে পরথুর বংশধরের নিকট আছে। তারপর গড়বালের বধান অঞ্চল অধিকারের জন্য রুদ্রচন্দ্র পরথুর নেতৃত্বে এক অভিযান প্রেরণ করেন। কত্যুর অঞ্চলের মধ্য দিয়া যাইবার সময় তথাকার রাজা শুকপাল গড়বালরাজের সাহায্যে বৈজনাথের দশ মাইল উত্তরে গয়লদামে উহা আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন, পরথুও নিহত হন। তখন স্বয়ং রুদ্র শুকপালকে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন এবং প্রাচীন কত্যুর রাজ্যের এই শেষ অংশ নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। রুদ্রচন্দ্র বালেশ্বরে বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন এবং তাঁহার মন্দিরের অধিকারীকে বহু ভূমি দান করেন। রুদ্রের পুত্র লক্ষ্মীচন্দ্র (১৫৯৭—১৬২১) মুক্তহস্তে মন্দির নির্মাণ ও ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মীচন্দ্রের পৌত্র বাজ বাহাদুরচন্দ্রের চল্লিশ বৎসর রাজত্বকাল (১৬৩৮—১৬৭৬) বৈচিত্রময়। তিনি শাজাহানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এবং ১৬৫৫ সালে মোগল সেনাপতি খলিলুল্লা খাঁর গড়বালের তুন অঞ্চল আক্রমণে সাহচর্য করিয়া নিজ রাজ্যের দক্ষিণাংশ মোগল-আক্রমণ হইতে নির্মুক্ত করেন। তারপর গড়বাল রাজ্য আক্রমণ করিয়া লোভার উত্তরে দেউলথালের নিকটস্থ জুনিয়াগড় দুর্গ দখল করিয়া তথাকার নন্দাদেবী-মূর্তি অল্মোড়ায় লইয়া আসেন। রাজ্যের পূর্ব সীমান্তের হূনীয়দিগকে দমন করিয়া তিনি কৈলাস-যাত্রার পথ নির্বিঘ্ন করেন। ভীমতালের উচ্চ মন্দির তাঁহার নির্মিত এবং বহু দেবত্র ও ব্রহ্মত্র তাঁহার দান। কিন্তু শেষজীবনে সন্দেহগ্রস্ত ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। বাজ বাহাদুরের পুত্র উদ্যোগচন্দ্র ও পৌত্র জ্ঞানচন্দ্রের পর জগৎচন্দ্র রাজা হন (১৭০৭—১৭২০)। তিনি গড়বাল রাজ্য আক্রমণ করিয়া কিছুদিনের জন্য শ্রীনগর রাজধানী অধিকার করেন। তাঁহার সুশাসনে কুমাঁওন সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহার পুত্র দেবীচন্দ্রের

সময় বিষ্ট শ্রেণীর কর্মচারীগণ সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করিয়া রাজ্যে যথেচ্ছাচার আনয়ন করে, এবং ১৭২৬ সালে কোটার নিকট দেবীপুর-প্রাসাদে অবস্থান-কালে গুপ্ত হত্যা দ্বারা দেবীচন্দ্রের প্রাণনাশ করে। তাঁহার সহিত মূল চন্দ্রবংশ লোপ পায়।

তাহার পর উহার দৌহিত্র বংশের একজনকে রাজা খাঁড়া করিয়া কিছুদিন কর্তৃত্ব করার পর যখন ১৭৩০ সালে কর্মচারীগণ তাঁহাকেও হত্যা করে তখন তাহাদের বিপক্ষদল উঠিয়া চন্দ্রদিগের এক শাখা বংশের কল্যাণ নামে এক ব্যক্তিকে রাজা করে। কল্যাণ রাজা হইয়া বিষ্টদের নির্যাতন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয়ে চন্দ্রবংশীয় সমস্ত পুরুষের প্রাণ বা চক্ষু নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কুমাওনে এক আতঙ্কের সৃষ্টি করেন। এইরূপে চক্ষু নষ্ট হইলে চন্দ্রবংশীয় হিম্মত গোঁসাই কুমাওন হইতে পলায়ন করেন ও কাশীপুর-আক্রমণে পরাজিত হইয়া আঁওলায় রুহিলা সর্দার আলি মহম্মদ খাঁর শরণ লন। কল্যাণচন্দ্রের গুপ্তঘাতকেরা সেখানে তাঁহাকে হত্যা করায় ১৭৪৩ সালে আলি মহম্মদ দশ সহস্র সৈন্য দিয়া রহমৎ খাঁকে কুমাওন আক্রমণ করিতে পাঠান। কল্যাণচন্দ্র এই অভিযান রোধ করিবার কোন ব্যবস্থা করেন না, বা তাঁহার কাশীপুরের শাসন-কর্তা শিবদেব জোষীকেও কোন সাহায্য পাঠান না। ফলে রহমৎ রুদ্রপুরে ও হলদোয়ানিতে যুদ্ধে শিবদেবকে পরাস্ত করিয়া, ভীমতালের উপরের বরখেরি দুর্গ হস্তগত করিয়া, রামগড় ও পুড়ার পথে অল্মোড়ায় উপস্থিত হন ও রাজধানী অধিকার করিয়া লন। রুহিলাগণ পথে যে সকল দেবালয় পায় তাহা নষ্ট ও লুণ্ঠন করিয়া যায়, যাহার চিহ্ন আজিও রহিয়াছে। পরে গড়বাল-রাজের মধ্যস্থতায় রুহিলারা কুমাওন ত্যাগ করিয়া যায়। কল্যাণচন্দ্রও বাদশা মহম্মদ শার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মোগল-আক্রমণ হইতে নিজ রাজ্যের মুক্তি-প্রতিশ্রুতি লাভ করেন।

আল্মোড়ার উত্তরের বীণেশ্বরের মন্দির কল্যাণচন্দ্র নির্মাণ করেন এবং এখানে থাকিতে ভালবাসিতেন। শেষ কালে নিজেই অন্ধ হইয়া ১৭৪৮ সালে কল্যাণ মারা যান।

তখন তাঁহার পুত্র দীপচন্দ্র রাজা হন ও প্রায় ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহার প্রথম অর্দ্ধে মন্ত্রী শিবদেবের সুব্যবস্থায় রাজ্যের অবস্থা ভাল থাকে। মোগল বাদশার সহিত সম্প্রীতি হেতু ১৭৬১ সালে পাণিপত-ক্ষেত্রে দীপচন্দ্রের চারি সহস্র কুমাওনী সৈন্য মোগল পক্ষে যুদ্ধ করে। দীপচন্দ্র দুর্বলচিত্ত ও অতিরিক্ত ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। তাঁহার দুর্বলতার জন্য তাঁহার দুই প্রধান কর্মচারী শিবদেব ও হরিরামের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়া সশস্ত্র বিরোধে পরিণত হয়। শেষে শিবদেব জয়ী হন, কিন্তু অল্প দিন পরে ১৭৬৪ সালে কাশীপুরে বিদ্রোহী সৈন্যদের হাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তারপর শিবদেবের বিখ্যাত পুত্র হরদেব জোষী ও রাওতালা সৈনাধ্যক্ষ মোহন সিংহের মধ্যে প্রাধান্য লাভের জন্য ক্রমাগত চক্রান্ত ও যুদ্ধ বিগ্রহে কুমাওন বিপগ্রস্ত হইতে থাকে। ১৭৭৭ সালে মোহন সিংহ অল্মোড়া দখল করেন এবং হরদেবকে কারারুদ্ধ করিয়া ও শিরাকোট দুর্গে বন্দী দীপচন্দ্রকে হত্যা করিয়া মোহনচন্দ্র নাম লইয়া কুমাওনের রাজা হন। দীপচন্দ্রের সহিত প্রাচীন চন্দ্রবংশের লোপ হয়।

মোহন সিংহ রাজা হইয়াই তাঁহার বিপক্ষীয়দিগকে উচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৭৭৯ সালে গড়বালরাজ ললিত শাহ দ্বারাহাট অঞ্চল আক্রমণ করিলে মোহনের সৈন্য তাঁহার নিকট পরাজিত হয় ও বেগতিক দেখিয়া মোহন কুমাওন ত্যাগ করিয়া রামপুর রাজ্যে গিয়া আশ্রয় লন। তখন গড়বালরাজ স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র প্রদ্যুম্নকে কুমাওন সিংহাসনে বসান। হরদেব তাঁহার মন্ত্রী হন। ১৭৮৬ সালে ললিত

শাহের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়কীর্তি শ্রীনগরে রাজা হন। তখন ঐ সিংহাসনও অধিকার করার উদ্দেশে প্রদ্যুম্ন সৈন্য সহ হরদেবকে প্রেরণ করেন। জয়কীর্তি আক্রান্ত ও যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পীড়ায় মারা যান, তখন প্রদ্যুম্ন শ্রীনগরে গিয়া রাজা হন। কিন্তু অল্মোড়ায় তাঁহার প্রতিনিধি হরদেব বিপক্ষীয়দিগের আক্রমণে কুমাওন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, আর মোহন সিংহ আবার তথায় দেখা দেন্। কিন্তু ১৭৮৮ সালে হরদেব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কুমাওনে উপস্থিত হন, এবং অল্মোড়ার নিকট যুদ্ধে মোহন সিংহকে বন্দী করিয়া নিহত করেন। কিন্তু প্রদ্যুম্ন আর কুমাওন সিংহাসন গ্রহণ করেন না। ঐ বৎসরই আবার বিপক্ষীয়-দিগের নিকট পরাস্ত হইয়া হরদেব গড়বালে আশ্রয় লন, তখন মোহন সিংহের পুত্র মহেন্দ্র সিংহ কুমাওনের রাজা হন।

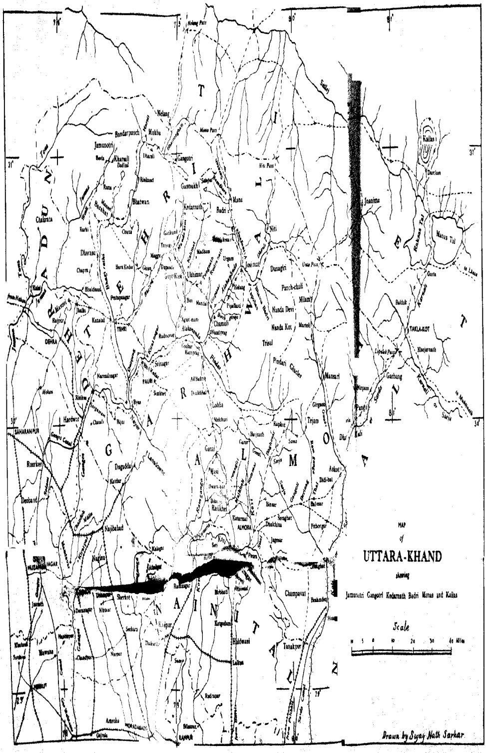
কুমাওনের এই অবস্থায় গুরখা সেনাপতি রণ বাহাদুর হরদেবের সহিত চক্রান্ত করিয়া ১৭৯০ সালে কুমাওন আক্রমণ করিয়া অল্মোড়া দখল করেন। মহেন্দ্র সিংহ পলায়ন করেন। তখন বৃটিশ রেসিডেন্টের মধ্যস্থতায় তাঁহাকে তরাই অঞ্চলে কিছু জায়গির দিয়া সমস্ত কুমাওন গুরখারা হস্তগত করে। ১৮১৫ সালে নবোদিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট-প্রেরিত অভিযান গুরখাদিগের হাত হইতে কুমাওন দখল করিয়া লয়। তৎপর শাসনের সুবিধার জন্য উহা অল্মোড়া ও নৈনীতাল দুই জেলায় বিভক্ত হয়।

এই সব ব্যাপারের নায়ক হরদেব জোষীর কথা কিছু বলা যাউক। গুরখারা অল্মোড়া অধিকার করিলে তিনি তথায় থাকিয়া তাহাদের গড়বাল আক্রমণের পরামর্শদাতা হন কিন্তু তলে তলে প্রদ্যুম্ন শাহকে পুনরায় কুমাওনে রাজা করিবার ফন্দিতে থাকেন। গুরখারা ইহা জানিতে পারিয়া ১৭৯৩ সালে একবার নেপালে ফেরার সময় তাঁহাকে

সহজে নয়। কিন্তু হরদেব পথ হইতে পলায়ন করিয়া নানা বিপদ পার হইয়া শ্রীনগরে উপনীত হন, এবং দশ বৎসর ধরিয়া নানা উপায়ে গুরখাদের গড়বাল রাজ্য-গ্রাসে বাধা দিতে থাকেন। ১৮০৪ সালের আরম্ভে গুরখাদের সহিত যুদ্ধে প্রত্যুম্ন নিহত হইলে, ভগ্নহৃদয় হরদেব কনখলে গিয়া বাস করেন ও গুরখাদিগের অত্যাচার-কাহিনী বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে জানাইতে থাকেন। অবশেষে ১৮১৫ সালে বিজয়ী বৃটিশ ফৌজের সহিত হরদেব অল্মোড়ায় প্রবেশ করেন। তথায় ঐ বৎসর জুলাই মাসে ৬৯ বৎসর বয়সে তাঁহার বিচিত্র জীবন লীলা শেষ হয়।

বৃটিশ গভর্ণমেন্ট কুমাওন অধিকার করিলে শেষ রাজা মহেন্দ্র সিংহ ও তাঁহার পিতৃব্য লাল সিংহের তরফ হইতে রাজ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন হয়, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হয় না। তাঁহাদের জন্য কিছু পেন্সন ও জমিদারী মাত্র ব্যবস্থা হয়। মহেন্দ্র সিংহের বংশধর পেন্সনের সহিত রাজা খেতাব লইয়া অল্মোড়ায় বাস করেন এবং লালসিংহের বংশধর রাজা খেতাব সহ কাশীপুরে থাকেন (*The Himalayan Districts*, II, p. 606)। সম্প্রতি (১৯০৯ সালে) অল্মোড়ার রাজা পরিণত বয়সে মারা গিয়াছেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। এখন কাশীপুরের অপ্রাপ্ত-বয়স্ক রাজা তাঁহার উত্তরাধিকারী এবং একদা পরাক্রান্ত কুমাওন রাজ-বংশের একমাত্র প্রতিনিধি।

চন্দ্ররাজগণ একান্ত শিবভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের নির্মিত শিবমন্দির কুমাওনের যথা তথা দেখা যায়। এসকলে এবং পূর্বের ব[illegible]ন্দিরে তাঁহারা দেবত্র দিয়া গিয়াছেন। এটকিনসন সাহেবের গ্র[illegible] ইহাদের বিস্তৃত তালিকা আছে।


MAP
of
UTTARA-KHAND
showing
Jamunotri Gangotri Kedarnath Badri Manas and Kailas
Scale
5 0 10 20 30 40 Miles
Drawn by Syaj Nath Sarkar
Jamunotri
Gangotri
Gaumukh
Kedarnath
Badri
Mana
Niti
Josimat
Nanda Devi
Nanda Kot
Trisul
Pindari Glacier
Kailas
Manas Tal
Rakshas Tal
Darchan
Gurla
TAKLA-KOT
Khojarnath
Garbang
Chakrata
DEHRA
Rajpur
TEHRI
Srinagar
PAURI
Hardwar
Roorkee
Deoband
SAHARANPUR
MUZAFFARNAGAR
Najibabad
Nagina
Kotdwar
Dugadda
Ranikhet
ALMORA
Haldwani
Kathgodam
Champavat
Tanakpur
Pithorgarh
Askot
Bageswar
Baijnath
MORADABAD
RAMPUR
Bilaspur
Rudrapur
Lalkua
Kashipur
Amroha
Chandpur
Mawana
MEERUT